ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

কর্তৃত্ববাদ পতন-পরবর্তী দেড় বছর: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

সার-সংক্ষেপ

০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

(পরিমার্জিত সংস্করণ ৩০ এপ্রিল ২০২৬)

কর্তৃত্ববাদ পতন-পরবর্তী দেড় বছর: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মুহাম্মদ বদিউজ্জামান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিচালনা
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো*
মো. জুলকারনাইন, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো-কোয়ালিটেটিভ*
ফারহানা রহমান, *রিসার্চ ফেলো*
রাজিয়া সুলতানা, *রিসার্চ ফেলো*
মো. মোস্তফা কামাল, *রিসার্চ এসোসিয়েট-কোয়ালিটেটিভ*
মোঃ মোহাইমেনুল ইসলাম, *রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট*

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণার মান উন্নত করার জন্য নিয়মিতভাবে তথ্য দেওয়া, বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান মতামত ও সহযোগিতা প্রদান করার জন্য রিসার্চ ও পলিসি বিভাগের সকল সহকর্মীর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা। গবেষণাটি পরিচালনায় সার্বিক সহায়তা ও তত্ত্বাবধান এবং খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা করেছেন রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামান। প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, পরিচালক, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগ এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগের সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। সবশেষে গবেষণার ধারণাপত্র তৈরি থেকে শুরু করে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করার সময় পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা, মতামত ও তথ্য প্রদানের জন্য টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের এবং নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জমানের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

প্রকাশ: ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ (পরিমার্জিত সংস্করণ ৩০ এপ্রিল ২০২৬)

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২; ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: https://www.ti-bangladesh.org

কর্তৃত্ববাদ পতন-পরবর্তী দেড় বছর: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

সার-সংক্ষেপ

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহে নজিরবিহীন সহিংসতা, রক্তপাত ও ত্যাগের বিনিময়ে ৫ আগস্ট ২০২৪ কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন হয়। ৮ আগস্ট ২০২৪ ড. মুহম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়, যেখানে ২১ জন উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য (প্রধান উপদেষ্টা ও ২০ জন উপদেষ্টা), চারজন বিশেষ সহকারী ও দূত (উপদেষ্টার পদমর্যাদা), এবং পাঁচজন বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা) এই সরকারে বিভিন্ন পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী আন্দোলন ও পরবর্তীতে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার মূল প্রত্যাশা ছিল একটি বৈষম্যহীন, সম-অধিকারভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামো সংস্কার এবং নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠা করা, যার মূল অভীষ্ট ছিল জনপ্রতিনিধিত্ব, সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও চর্চায় আমূল পরিবর্তন যেখানে জনগণের রায় ও অর্পিত ক্ষমতায় এবং জনগণের কাছে কার্যকর জবাবদিহির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সময় এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুকোমুখী হয় যার মধ্যে দুর্বল অর্থনীতি, বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের চাপ, সব খাত ও প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক দলীয়করণের কারণে পতিত সরকারের সমর্থক ও সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর অসহযোগিতা, দুর্বল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, দুর্নীতিগ্রস্ত সেবা ব্যবস্থা, এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও অরাজকতা উল্লেখযোগ্য।

কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর ছাত্র-জনতার প্রত্যাশা ছিল আইনের শাসন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র ও প্রশাসন, রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কাঠামো সংস্কার, খাত ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সংস্কার, নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, এবং তরুণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান। সময়ের ধারাবাহিকতা ও উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তী সরকারের মূল লক্ষ্য নির্ধারিত হয় ন্যায়বিচার তথা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও তার পূর্বে সংঘটিত অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার; রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সংস্কার; এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজন করা। এর পাশাপাশি দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ, অর্থপাচার রোধসহ রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারের নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন করাও ছিল অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম দায়িত্ব।

গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) প্রধান লক্ষ্য। এ সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যকরতার ওপর গবেষণা ও অধিপরামর্শ টিআইবির ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ। ইতোপূর্বে বিভিন্ন সময়ে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় ও সরকারি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে। এর অংশ হিসেবে টিআইবি কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর প্রথম ১০০ দিন এবং পরবর্তীতে অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছর মেয়াদের ঘটনাপ্রবাহের ওপর পর্যবেক্ষণভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। দুর্নীতি প্রতিরোধ, গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রকাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে টিআইবি'র পক্ষ থেকে সুপারিশমালা প্রস্তাব (২৮ আগস্ট ২০২৪) করা হয় এবং পরবর্তীতে খাতভিত্তিক নীতি-পরামর্শ (পলিসি অ্যাডভোকেসি) অব্যাহত রাখা হয়। রাষ্ট্র সংস্কারের প্রত্যাশা পূরণে অন্তর্বর্তী সরকারসহ সকল অংশীজনের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ এবং এর ধারাবাহিকতায় পর্যবেক্ষণভিত্তিক বর্তমান গবেষণার এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য, পরিধি ও গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর অন্তর্বর্তী সময়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে-

১. অন্তর্বর্তী সময়ে বিচার, সংস্কার, নির্বাচন, সরকারি কার্যক্রম, দুর্নীতি প্রতিরোধ, এবং গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করা;
২. উল্লিখিত কার্যক্রমে বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা; এবং
৩. এসব কার্যক্রমের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে চিহ্নিত করা।

এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও তার পূর্বে সংঘটিত অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত ও বিচার; রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সংস্কার; সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম; রাষ্ট্রীয়/সরকারি বিভিন্ন খাতের নিয়মিত কার্যক্রম (প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, বিচারিক সেবা, আর্থিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকারব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পরিবেশ, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি কার্যক্রম); অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধ; এবং বিভিন্ন অংশীজনের (রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম, সামরিক বাহিনী) ভূমিকা পর্যালোচনা।

এই গবেষণায় গুণগত গবেষণাপদ্ধতি ব্যবহার করে অন্তর্বর্তী সরকার ও অন্যান্য অংশীজনের বিচার, রাষ্ট্র সংস্কার, নির্বাচন, দুর্নীতি প্রতিরোধ, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে পরিমাণগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করার পর অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস হতে তথ্যের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা হয়েছে। এই গবেষণায় বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট সরকারি পরিপত্র, অধ্যাদেশ ও বিধিমালা (খসড়া/ চূড়ান্ত), সংবাদপত্র ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংবাদ, প্রবন্ধ, মতামত ও বিশ্লেষণ, রাজনৈতিক দল, বিশেষজ্ঞ, গবেষক, সাংবাদিক, ছাত্র ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের প্রকাশিত সাক্ষাৎকার এবং সরকারি ও অন্যান্য ওয়েবসাইট ইত্যাদি। গবেষণায় ৫ আগস্ট ২০২৪ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল

১. বিচার

ক. জুলাই আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ

অগ্রগতি: জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার হত্যাকারী, হত্যার নির্দেশদাতা ও ইন্ধনদাতাদের বিরুদ্ধে সারা দেশে ১৯ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ১ হাজার ৭৮৫টি যার মধ্যে হত্যা মামলা ৮৩৭টি। দায়েরকৃত মামলাগুলোর মধ্যে ১০৬টিতে চার্জশিট দেওয়া হয় যার মধ্যে ৩১টি হত্যা মামলায় চার্জশিট দেওয়া হয়। এই মামলাগুলোতে পতিত সরকারের মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যসহ ১২৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গণ-অভ্যুত্থানে হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সারা দেশে পুলিশের বিরুদ্ধে ৭৬১টি মামলায় ১ হাজার ১৬৮ জন পুলিশকে আসামি করা হয় এবং ৬১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ৪৫০টি অভিযোগ দায়ের করা হয়। ট্রাইব্যুনালে ৪৫টি মামলায় পতিত সরকারপ্রধানসহ ২০৯ জনকে আসামি করা হয় এবং ৮৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

দায়েরকৃত মামলাগুলোর মধ্যে তিনটি মামলায় বিচারের রায় ঘোষণা করা হয়। একটি মামলার রায়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং রাজসাক্ষী হওয়ায় পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শককে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অপর একটি মামলায় তিন পুলিশ কর্মকর্তার মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। এছাড়া আরেকটি মামলায় একজন সংসদ সদস্যসহ ছয়জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দুটি বেঞ্চে মোট ১০টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের অপর একটি অগ্রগতি হচ্ছে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩ সংশোধন করে রাজনৈতিক দলের অপরাধের বিচার করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

ঘাটতি: কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর উল্লেখযোগ্যসংখ্যক অভিযুক্ত গোপনে দেশত্যাগ করে। অভিযুক্তদের দেশত্যাগের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা সংস্থা ও স্থানীয় রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে সহায়তা করার অভিযোগ রয়েছে। কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী সময়ে ক্ষেত্রবিশেষে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং মামলায় ঢালাওভাবে আসামীদের নাম দেওয়া হয়েছে। এসব মামলায় সারা দেশে আসামী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয় প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার জনকে এবং ২১ হাজার ৮৫৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পতিত সরকারপ্রধানের বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যা ৬৬৩টি, যার মধ্যে ৪৫৩টি হত্যা মামলা। জুলাই আন্দোলনে বিভিন্ন ফৌজদারি অপরাধে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে করা ৪ হাজার ১৭টি মামলায় অভিযুক্তের সংখ্যা ২ লাখ ২৪ হাজার ৮১৩ জন, এবং এদের মধ্যে ৭৫ হাজার ৪০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে পরর্বর্তী সময়ে গ্রেপ্তারকৃতদের ৫৫ ভাগ আসামী জামিনে মুক্ত হয়।

জুলাই আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধকে কেন্দ্র করে মামলা ও গ্রেপ্তার বাণিজ্যের অভিযোগ উঠে। পূর্বশত্রুতা, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করা এবং চাঁদাবাজি ও হয়রানির উদ্দেশ্যে এসব মামলায় আসামি করা হয়। আবার মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার নামে চাঁদাবাজি করা হয়। চাপের মুখে তদন্ত না করে পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করার অভিযোগও ওঠে। এছাড়া বিচার প্রক্রিয়াও ক্ষেত্রবিশেষে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে অনেকে বিচার প্রক্রিয়ায় প্রতিশোধপরায়ণ হয়রানির শিকার হয়েছে – আদালতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতিতে আক্রমণের শিকার এবং লাঞ্ছিত হয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নিয়োগকৃত বিচারক ও কৌঁসুলিদের নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক ও সমালোচনা লক্ষ করা গেছে – বিশেষ করে তাদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে।

মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারপ্রক্রিয়া শুরু এবং কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি হলেও ঢালাও মামলা এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অপরাধের ধরন অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট মামলা না দেওয়ার ফলে মামলার ভিত্তি দুর্বল হয়েছে। পদ্ধতিগত জটিলতা ও ঘটনার পরিষ্কার চিত্র না থাকায় মামলাগুলোর অগ্রগতি হয়নি এবং এসব মামলার প্রতিবেদন তৈরিতে তদন্ত কর্মকর্তারা চ্যালেঞ্জ সম্মুখীন হন। পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিভাগীয় পদক্ষেপের বাইরে বাস্তবে পুলিশের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর জবাবদিহির অগ্রগতি হয়নি, যেখানে সরকারের সদিচ্ছা ও সক্ষমতার ঘাটতি লক্ষণীয় ছিল। অন্তর্বর্তী সময়ে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরন না করে গ্রেপ্তার ও রিমান্ডের পুরনো ধারা লক্ষ করা যায়। এসব ক্ষেত্রে অযৌক্তিক মামলা দায়ের ও বিনা বিচারে আটক, মামলায় জামিনযোগ্য হলেও জামিন না দিয়ে দীর্ঘদিন আটকে রাখা, ক্ষেত্রেবিশেষে সরকারি প্রভাব খাটানোর বিষয় লক্ষ

করা যায়। কিছু ক্ষেত্রে সাংবাদিক ও পেশাজীবীদেরকে বিভিন্ন হত্যা মামলার আসামি করা হয়েছে। বিচারের রায় ঘোষণা সরাসরি সম্প্রচার করার ইতিবাচক দৃষ্টান্ত দেখা গেলেও পুরোপুরি ন্যায্য ও আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে বিচারকার্য সম্পাদন ও বিচারের রায় দেওয়ার বিষয়টি সমালোচিত হয়েছে। বিচার প্রক্রিয়ার দুর্বলতার ফলে প্রকৃত অপরাধীদের ন্যায়বিচার প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

খ. গুম সংক্রান্ত তদন্ত ও বিচার

অগ্রগতি: গুম সংক্রান্ত তদন্ত ও বিচারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির মধ্যে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তরের (ওএইচসিএইচআর) গুমসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ওপর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন প্রকাশ অন্যতম। পাশাপাশি গুম থেকে সকল ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য ২৯ আগস্ট ২০২৪ গুমবিরোধী আন্তর্জাতিক কনভেনশনে (ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দ্য প্রটেকশন অব অল পারসনস ফ্রম এনফোর্সড ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স - আইসিপিপিইডি) স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ। গুমের বিষয় তদন্ত ও ভুক্তভোগীদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য ২৭ আগস্ট ২০২৪ তারিখে অন্তর্বর্তী সরকার গুম সংক্রান্ত তদন্ত কমিশন গঠন করে। কমিশনে ১ হাজার ৯১৩টি গুমের অভিযোগ দাখিল করা হয় এবং এর মধ্যে যাচাই-বাছাই শেষে ১ হাজার ৫৬৯টি অভিযোগ সংজ্ঞা অনুযায়ী গুম হিসেবে বিবেচিত হয়। এছাড়া ২৮৭টি অভিযোগ 'মিসিং অ্যান্ড ডেড' ক্যাটাগরিতে লিপিবদ্ধ করা হয়।

গুমসংক্রান্ত তদন্ত কমিশন প্রতিবেদন চূড়ান্ত করে প্রধান উপদেষ্টার কাছে জমা দেন এবং পরবর্তীতে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। গুমের ঘটনাগুলোয় র‍্যাব, পুলিশ, ডিজিএফআইসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার গুমের শিকার হয়ে এখন পর্যন্ত নিখোঁজ থাকা ব্যক্তিদের নামে তার পরিবারের কাছে 'নিখোঁজ সনদ' প্রদান করার ব্যাপারে আশ্বাস প্রদান করে। এছাড়া ঢাকায় তিন বছরের জন্য জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কমিশনারের কার্যালয় স্থাপনের বিষয়েও সমঝোতা হয়। গুম ও জুলাই অভ্যুত্থানে হত্যার ঘটনায় জড়িত সেনা সদস্যদের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচার শুরু হয়। এর মধ্যে গুম-নির্যাতনের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের দুটি মামলায় এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় করা একটি মামলায় ১৫ জন সেনাকর্মকর্তা এবং অপর একটি মামলায় ১২ জন সেনা কর্মকর্তার বিচার কার্যক্রম শুরু হয়।

ঘাটতি: গুম সংক্রান্ত তদন্ত ও বিচারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আলামত নষ্টের অভিযোগ সত্ত্বেও সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহির আওতায় নিয়ে আসা হয়নি। গুমের বিচারের ক্ষেত্রেও ধীরগতির অভিযোগ উঠেছে। গ্রেফতারি পরোয়ানা ও দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি থাকা সত্ত্বেও ১০ জন সেনা কর্মকর্তার বিদেশে পলায়ন রোধ করার ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। গুমে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও সেনা কর্মকর্তাদের একাংশের বিচার শুরু হলেও মূল হোতাদের অনেকেই বিচারের বাইরে রয়ে গেছে। জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন ও গুম কমিশনের সুপারিশ সত্ত্বেও র‍্যাব বিলুপ্তি ও গোয়েন্দা বাহিনীর সংস্কার বাস্তবায়নে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হয়নি। র‍্যাব ও টিএফআই সেল বিলুপ্ত না করে র‍্যাবের নাম (প্রস্তাবিত নাম স্পেশাল ইন্টারভেনশন ফোর্স বা এসআইএফ) ও পোশাক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং র‍্যাবের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে এনটিএমসি বিলুপ্ত করা হলেও একই ধরনের আরেকটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়েছে।

গুমের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর জড়িত সদস্যদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের দুর্বল অবস্থান দেখা গেছে। র‍্যাব বিলুপ্তি ও গোয়েন্দা বাহিনীর সংস্কার সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকার দৃশ্যত নেতিবাচক অবস্থান নিয়েছে। অন্যদিকে মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় হত্যাকাণ্ডের মামলায় অভিযুক্ত ১৫ জন সেনাকর্মকর্তাকে বৈষম্যমূলক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সেনা কর্তৃত্বাধীন সেনানিবাসের অভ্যন্তরে সাবজেল বা উপ-কারাগারে রাখা হয়।

গ. জুলাই যোদ্ধাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট উদ্যোগ

অগ্রগতি: জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের তালিকা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অধিদপ্তর গঠন ও 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার এবং জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারি করে গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ এবং আহত ব্যক্তিদের যথাক্রমে 'জুলাই শহীদ' এবং 'জুলাই যোদ্ধা' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত ও শহীদদের জন্য জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন গঠন করা হয় এবং তাদের আর্থিক সহায়তা ও পুনর্বাসন এবং চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের জন্য ২৩২ কোটি ৬০ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রস্তাবিত বরাদ্দ ধরা হয় ৪০৫ কোটি ২০ লাখ টাকা। ৭৭২টি জুলাই শহীদ পরিবারকে এককালীন অনুদানের ১০ লাখ টাকা ও ১০০ পরিবারকে পুরো ৩০ লাখ টাকা প্রদান করা হয়। ২০২৫ সালের জুলাই মাস থেকে পরিবার প্রতি ২০ হাজার টাকা ভাতা চালু করা হয়। ৭ হাজার ৩০০ শহীদ পরিবার এবং আহত জুলাইযোদ্ধাকে ১১৬ কোটি ২১ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করাসহ ৭৮ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে প্রেরণ করা হয়।

ঘাটতি: হতাহতদের চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশে বিলম্ব হওয়ার কারণে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদ সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি চলমান ছিল। এছাড়া গণ-অভ্যুত্থানে আহতদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ, সন্তোষজনক চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের দাবিতে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অধিদপ্তর ও জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন কাজের পরিধি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার

পাশাপাশি এ সংক্রান্ত কার্যক্রমে সমন্বয়ের ঘাটতি দেখা গেছে। অন্যদিকে অনুদান প্রদানের কিছু ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগও পাওয়া গেছ। "জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর" নির্মাণে সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুসরণে ঘাটতিও বিদ্যমান ছিল।

২. অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার উদ্যোগ

ক. রাষ্ট্র সংস্কার

অগ্রগতি: রাষ্ট্র সংস্কার এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। দুই পর্যায়ে ১১টি বিষয় ও খাতভিত্তিক সংস্কার কমিশন গঠন করা হয় (প্রথম দফায় সংবিধান, নির্বাচনব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, এবং দ্বিতীয় দফায় গণমাধ্যম, স্বাস্থ্য, নারীবিষয়ক, শ্রম বিষয়ক, এবং স্থানীয় সরকার বিষয়ক সংস্কার কমিশন)। জাতীয় প্রতিনিধিত্বমূলক জরিপ ও অনলাইনে মতামত সংগ্রহ, এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ এসব কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করা হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচনব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, সংবিধান ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশসমূহ বিবেচনা ও জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা, এবং গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রস্তাবগুলোর ওপর একটি জাতীয় অবস্থান তৈরি করা। ঐকমত্য কমিশনে ৩৩টি রাজনৈতিক দলের সাথে দুই পর্বে মোট ৫২টি সংলাপ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্যায়ে গঠিত ছয়টি সংস্কার কমিশনের ৯২৬টি সুপারিশের মধ্যে ১৬৬টি সংস্কার প্রস্তাব সংলাপ অধিবেশনগুলোতে উত্থাপিত হয়। কিছু ভিন্নমতসহ ৮৪টি সংস্কার প্রস্তাবের ঐকমত্যের ভিত্তিতে জুলাই সনদের খসড়া চূড়ান্ত হয়। সংস্কার প্রস্তাবের মধ্যে ৪৮টি ছিল সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত, যার মধ্যে ১৮টি প্রস্তাবে ভিন্নমত বা 'নোট অব ডিসেন্ট' ছিল।

জুলাই জাতীয় সনদ রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য একটি রাজনৈতিক ঐকমত্যের দলিল। ২০২৫ সালের ১৭ অক্টোবর বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ ২৪টি রাজনৈতিক দল ও জোট, এবং জাতীয় নির্বাচনের পর এনসিপি জুলাই সনদে স্বাক্ষর করে। জুলাই জাতীয় সনদের মূল প্রস্তাবগুলো ছিল রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি অন্তর্ভুক্ত করা এবং বাংলাদেশকে বহু-জাতি, বহু-গোষ্ঠী, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু সংস্কৃতির দেশ হিসেবে ঘোষণা করা; প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র ক্ষমতা কমানোসহ এক ব্যক্তি জীবনে সর্বোচ্চ ১০ বছর (একাধিক মেয়াদে মোট) প্রধানমন্ত্রী পদে থাকা এবং একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধানের পদে না থাকার বিধান রাখা; আইনসভা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট করা; সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে নিয়োগ; বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ; সাংবিধানিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (যেমন: ইসি, পিএসসি) বাছাই কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ নিশ্চিত করা; এবং ক্ষমতার অপব্যবহারকে সাংবিধানিকভাবে অবৈধ নিশ্চিত করা। সনদ বাস্তবায়নে গণভোট আয়োজনের জন্য 'জাতীয় জুলাই সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫' জারি করা হয়। চারটি প্রশ্নের মাধ্যমে জুলাই সনদের ওপর গণভোট আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নির্বাচিত সরকার সংসদ পরিচালনার পাশাপাশি সাংবিধানিক সংস্কার পরিষদের দায়িত্ব পালন করবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

অন্যদিকে ৫ আগস্ট ২০২৫ 'জুলাই ঘোষণাপত্র' আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করা হয়। জুলাই ঘোষণাপত্র ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যে ২৮ দফার একটি স্মারক দলিল, যেখানে জুলাই বিপ্লবের রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি, ফ্যাসিবাদমুক্ত ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার এবং প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় সংস্কারের রূপরেখা রচিত হয়।

ঘাটতি: সংস্কারের জন্য বিভিন্ন কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে খাত বা প্রতিষ্ঠান নির্ধারণে কোনো সুনির্দিষ্ট কৌশল অনুসরণ করা হয়নি। ১১টি কমিশন, বিভিন্ন শ্বেতপত্র ও কমিটির বাইরে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অন্য অনেক খাত, যেমন শিক্ষা, কৃষি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবসার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাত কোন যুক্তিতে বাদ পড়েছে তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলো প্রতিনিধিত্বশীল না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ছয়টি কমিশনে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো প্রতিনিধিত্ব না থাকা, নারীর সংখ্যা কম থাকা, সাবেক আমলার আধিক্য, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রাধান্য লক্ষ করা গেছে। কোনো কোনো সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন যেমন জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের ওপর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াও দেখা গেছে। নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ছিল কমিশনের সুপারিশ প্রত্যাখ্যান, সুপারিশ বাতিল এবং কমিশন বিলুপ্ত করার দাবি করা এবং এ নিয়ে আন্দোলন করা। তবে এ ধরনের দাবি উঠলেও সংস্কারবিরোধী শক্তি চিহ্নিত করা এবং সরকারের পক্ষ থেকে কোনো জোরালো অবস্থান নেওয়া হয়নি। সবগুলো সংস্কার কমিশনের কাছ থেকে সংগৃহীত অন্তর্বর্তী মেয়াদে আশু বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশমালা নিয়ে সরকারের পদক্ষেপ সম্পর্কে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বাস্তবে দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি দেখা যায়নি। অন্যদিকে প্রথম পর্যায়ে গঠিত ছয়টির বাইরের সংস্কার কমিশন, এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর শ্বেতপত্র ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন সম্পর্কে কোনো কর্মপরিকল্পনাও ছিল না।

সংস্কারের ক্ষেত্রে আলোচনা প্রক্রিয়ায় ঘাটতি দেখা গেছে। কোন কোন প্রস্তাব আলোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তার কোনো ব্যাখ্যা ছিল না। এছাড়া অন্যান্য ঘাটতির মধ্যে ছিল কোনো রাজনৈতিক দলকে আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানোর মানদণ্ড পরিষ্কার না থাকা; ঐকমত্য

নির্ধারণের মানদণ্ড না থাকা; রাজনৈতিক দলের বাইরে অন্যান্য অংশীজনের সাথে আলোচনা না করা বা আলোচনায় সম্পৃক্ত না করার অভিযোগ; এবং প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ও শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়ার অভিযোগ অন্যতম। জাতীয় সংসদে নারী আসন বিষয়ে জুলাই সনদে ঐকমত্যের নামে যা হয়েছে তার ফলে নারীদের কার্যকর প্রতিনিধিত্বের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়। কর্তৃত্ববাদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং জনগণের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন, চাঁদাবাজি এবং আর্থিক খাতসহ রাষ্ট্রীয় দখলের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত গোয়েন্দা সংস্থাগুলো, যেমন ডিজিএফআই, এসবি, ডিবি, এনএসআই-এর ক্ষেত্রে সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। সরকারের পুরো মেয়াদে তথ্য কমিশন ও মানবাধিকার কমিশনের মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ কমিশন গঠনেও সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

রাষ্ট্র সংস্কারের বেশ কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে ঐকমত্যে পৌঁছানো গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হলেও প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মৌলিক সংস্কারের প্রস্তাবে 'নোট অব ডিসেন্ট' দিয়ে জুলাই সনদ স্বাক্ষরের ফলে রাষ্ট্র সংস্কারের মূল অভীষ্ট অর্জনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। শুরু থেকে কোনো পর্যায়ে সংস্কার-প্রতিরোধক মহলকে চিহ্নিত করে প্রতিহত করার গুরুত্ব অনুধাবন না করে বরং এই অপশক্তির কাছে ধারাবাহিকভাবে আত্মসমর্পণের ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ বাতিল, অনেক সংস্কার-পরিপন্থী সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এমনকি জুলাই সনদকে যুক্তিহীনভাবে লঙ্ঘন করে নেতিবাচক উদাহরণ স্থাপন করা হয়েছে। সংস্কার কমিশনগুলোর আশু বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর বাস্তবায়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সাংবিধানিক সংস্কার কমিশন বাদে বাকি ১০টি কমিশনের মধ্যে মোট ৩৬৭টি আশু বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ চিহ্নিত হলেও সেপ্টেম্বর ২০২৫ সাল পর্যন্ত মাত্র ৪৮টি সংস্কার সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে। এর বাইরে দশটি কমিশনের মোট ১,৪১৬টি সুপারিশ বাস্তবায়নে কোনো সুনির্দিষ্ট পথরেখা নির্ধারিত হয়নি। বাস্তবে রাষ্ট্র সংস্কারের ভিত্তি স্থাপনের সুযোগের যথাযথ সদ্ব্যবহার করা হয়নি।

খ. আইনি সংস্কার

অগ্রগতি: ৮ জুলাই ২০২৪ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদে মোট ১৩৩টি অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয়। সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত বিভিন্ন কমিশন/কমিটি কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে উল্লেখযোগ্য আইনি সংস্কার করা হয়। আইনি সংস্কারগুলোর মধ্যে রয়েছে জুলাই সনদে লিপিবদ্ধ সংবিধান ও অন্যান্য সংস্কারমূলক সুপারিশ বাস্তবায়ন সম্পর্কে গণভোটের আয়োজন এবং বেশ কিছু সংস্কারমূলক অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও নির্বাহী সিদ্ধান্ত, যার কিছু সংশ্লিষ্ট সংস্কার কমিশনপ্রসূত, আর কিছু সরকারের নিজস্ব বিবেচনায় গৃহীত। বিচার বিভাগের স্বাধীনতার পথে স্বাধীন সচিবালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইনি সংস্কার অন্তর্বর্তী সরকারের শীর্ষস্থানীয় অর্জনগুলোর মধ্যে অন্যতম। কয়েকটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিচার বিভাগ ছাড়া অন্য কিছু খাত বা প্রতিষ্ঠান, যেমন দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, মহা হিসাব-নিরীক্ষক, রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা, সাইবার সুরক্ষা, ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা, এবং বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) ইত্যাদির জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হয়, এবং এসব অধ্যাদেশের মধ্যে বেশ কিছু ইতিবাচক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়া স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, বিচার বিভাগ ও সরকারি কর্মচারীদের ব্যক্তিগত আয় ও সম্পদের বিবরণী নিয়মিত জমাদানের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। এসময়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আইনি সংস্কারও করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে স্থানীয় সরকার সংস্কারে সব পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে দলীয় প্রতীক বরাদ্দের ধারা বাতিল করা, সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিল, তথ্য অধিকার আইনের সংশোধন এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি আইন বাতিল এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা (২০২৫) প্রণয়ন করা। এছাড়া বন ও পরিবেশ সংরক্ষণে বেশ কয়েকটি অধ্যাদেশ প্রণয়ন এবং হাইকোর্টের আদেশ ও নির্দেশনা জারিসহ ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ জারি এবং নির্বাচন-সংক্রান্ত আইনি সংস্কার করা হয়।

ঘাটতি: মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম ছাড়া একতরফাভাবে অংশীজনদের সম্পৃক্ত না করে অধ্যাদেশগুলো প্রণয়ন করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে অংশীজনদের সম্পৃক্ত করা হলেও তাদের মতামতের প্রতিফলন অধ্যাদেশে লক্ষ করা যায়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে খসড়া অধ্যাদেশ স্বল্প সময়ের জন্য লোক-দেখানোভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে দায় মেটানো হয়। যেসব ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা কাটিয়ে, এমনকি বিরাগভাজন হয়ে কোনো কোনো অংশীজন অধিপরামর্শের সুযোগ করে নিয়েছে সেসব ক্ষেত্রেও প্রতিশ্রুত সংশোধন কোনোরূপ ব্যাখ্যা ছাড়া অবহেলিত থেকে যায়। এমনকি কোনো কোনো অংশীজনদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করতে দেখা গেছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন, পুলিশ কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, সাইবার সুরক্ষা, ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা, জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি অধ্যাদেশসমূহের প্রতিটি ক্ষেত্রে জনস্বার্থের তুলনায় আমলাতন্ত্রসহ ক্ষমতাসীনদের একচ্ছত্র ও জবাবদিহিহীন কর্তৃত্বের চর্চা অব্যাহত রাখার সুযোগ রাখা হয়। পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ যেভাবে প্রণীত হয়েছে এর ফলে বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে পেশাগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করে জনকল্যাণমুখী, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক বাহিনী গঠনে দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত একটি স্বাধীন পুলিশ কমিশনের স্বপ্ন সম্পূর্ণভাবে ধূলিস্যাৎ হয়েছে। লোক-দেখানো এ অধ্যাদেশে এমন অনেক উপাদান রয়েছে যে এর ওপর ভিত্তি করে তথাকথিত পুলিশ কমিশন গঠিত হলে তা অবসরপ্রাপ্ত প্রশাসনিক ও পুলিশ আমলাদের ক্ষমতার অব্যাহত অপব্যবহারের রিসোর্ট ছাড়া আর কিছুই হবে না, এবং বাস্তবে এটি পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশটি একটি আন্তর্জাতিক মানের আইন হিসেবে পরিগণিত হতে পারতো যদি এক্ষেত্রে শেষ পর্যায়ে খসড়া প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় যেসব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীজনদের সম্পৃক্ত করা হয়েছিল তাদের অন্ধকারে রেখে অন্তর্ঘাতী প্রক্রিয়ায় এতে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের অপ্রতিরোধ্য সুযোগ সৃষ্টি না করা হতো। সাইবার

সুরক্ষা, ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা ও জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশে উল্লেখযোগ্য যুগোপযোগী ইতিবাচক বিধান থাকলেও প্রতিটিতে নিজস্ব আঙ্গিকে ও সামষ্টিকভাবে সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হাতে কোনো প্রকার বিচারিক সুরক্ষা ছাড়া জবাবদিহিহীনভাবে বাকস্বাধীনতা, ভিন্নমত ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা দমনের আইনগত ব্যবস্থা তৈরি করা হয়, যাতে কর্তৃত্ববাদী আমলের ন্যায় ব্যাপক নজরদারিভিত্তিক শাসনব্যবস্থা চলমান রাখার সুযোগ থাকে। তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের উদাসীনতাও লক্ষ করা গেছে। এছাড়া আইন প্রণয়নের পর সংশ্লিষ্ট খাতের কর্মচারীদের প্রবল বিরোধিতার মুখে আইন সংশোধনের উদ্যোগ নিতে দেখা গেছে, যেখানে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়াস ছিল, যেমন সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫। অন্যদিকে সরকারি হিসাব নিরীক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর একটি ধারার মাধ্যমে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের (সিএজি) সাংবিধানিক মর্যাদা খর্ব করা হয়।

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে রাষ্ট্র সংস্কারের মূলমন্ত্র তথা জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার অভীষ্টের পরিপন্থী বিভিন্ন বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়। যেসব অধ্যাদেশ প্রণীত হয়েছে তার মধ্যে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ ও এনজিও খাতের জন্য প্রযোজ্য ফরেইন ডোনেশনস (ভলান্টারি অ্যাক্টিভিটিজ) রেগুলেশন সংশোধনমূলক অধ্যাদেশের মতো ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকল ক্ষেত্রে প্রতিরোধক মহল, বিশেষ করে আমলাতন্ত্রের প্রভাবশালী মহলের অন্তর্ঘাতমূলক অপশক্তির কাছে সরকারের নতি স্বীকারের ফলে সংস্কার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। সার্বিকভাবে আইন প্রণয়ন ও জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত স্বচ্ছতা ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের চর্চার উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারেনি।

৩. নির্বাচন

অগ্রগতি: সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বেশ কিছু অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বিদ্যমান আইন অনুসরণ করে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করা হয়। নির্বাচন কমিশনের গৃহীত উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ও কার্যক্রমসমূহের মধ্যে রয়েছে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধন করা, যেখানে উল্লেখযোগ্য সংশোধনগুলো হচ্ছে ইভিএম বাতিল করে সম্পূর্ণ ব্যালটভিত্তিক নির্বাচনের সিদ্ধান্ত; একক প্রার্থীর ক্ষেত্রে 'না ভোট' এর প্রচলন; পলাতক (ফেরারি) আসামি এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা নির্বাচনে অযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া; দলীয় প্রতীকে ভোটে অংশগ্রহণ এবং জোটের বড় দলের প্রতীক ব্যবহার করে নির্বাচনের সুযোগ বন্ধ করা; নির্বাচনে সশস্ত্র বাহিনীকে (সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ড) আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা; এবং রাজনৈতিক দলে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অনুদান সীমা সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা নির্ধারণ করা।

এছাড়া নির্বাচন কমিশনের উল্লেখযোগ্য উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে ৩০০ সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশ এবং রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণবিধির সংশোধন করা। প্রথমবারের মতো প্রবাসী ভোটারদের জন্য আংশিক তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক পোস্টাল ব্যালট ও মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং 'পোস্টাল ভোট অ্যাপ' তৈরি করা হয় (Postal Vote BD)। পোস্টাল ভোটের জন্য নিবন্ধিত পোস্টাল ভোটারের সংখ্যা ছিল ১৫ লাখ ৩৩ হাজার ৬৮৩ জন। এর মধ্যে প্রবাসী ৭ লাখ ৭২ হাজার ৫৪২ এবং দেশে নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা ৭ লাখ ৬১ হাজার ১৪১ জন। এছাড়া ১২১টি দেশে পোস্টাল ব্যালট পাঠানো হয়।

অন্তর্বর্তী সময়ে নির্বাচন কমিশন ১৪টি নতুন রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধন দেয়। বর্তমানে নিবন্ধিত দলের সংখ্যা ৫৯টি। এছাড়া রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীকে বৈধ ঘোষণা করা হয় এবং আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা ও নিবন্ধন স্থগিত করা হয়।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত জানায় নির্বাচন কমিশন। অন্যদিকে ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি একই দিনে গণভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে হওয়ায় ভোট গ্রহণের সময় এক ঘণ্টা বৃদ্ধি করা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে গণভোট ও 'হ্যাঁ' ভোটের পক্ষে এনজিও, ব্যাংক ও ব্যাংকারদের প্রচারণার নির্দেশ দেওয়া হয়। ভোটার তালিকা হালনাগাদ করে মোট ভোটার সংখ্যা দাঁড়ায় ১২ কোটি ৭৬ লাখ ৯৫ হাজার ১৮৩ জন, যার মধ্যে নারী ভোটার ৬ কোটি ২৮ লাখ ৭৯ হাজার ৪২, এবং পুরুষ ভোটার ৬ কোটি ৪৮ হাজার ১৪ হাজার ৯০৭। নির্বাচনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতে ৮ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত মাঠে ৯ লাখ ৫৮ হাজার পুলিশ, বিজিবি, কোস্টগার্ড, আনসার, সেনাবাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ৪২,৭৬১টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ২৮,৬৬৩ (৬৭ শতাংশ) ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় এসব কেন্দ্রে ১৭ জন নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এছাড়া যানবাহন ও অস্ত্র বহনে নিষেধাজ্ঞা জারি এবং নির্বাচনকালে আইনশৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এসময়ে অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ এর মাধ্যমে ৮,৫৯৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ৮৫টি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে মাঠ প্রশাসনের জেলা প্রশাসক (ডিসি), পুলিশ সুপার (এসপি) এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) পদে ব্যাপক রদবদল করা হয় এবং এক সপ্তাহের ব্যবধানে ৫০টি জেলায় নতুন ডিসির পদায়ন করা হয়। নির্বাচনী আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে ৪৬টি আসনের সীমায় পরিবর্তন আনা হয়। তবে আসনের সীমানা পরিবর্তন বিষয়ে ১,৮৯৩টি আপত্তি আসে এবং

এসব আপত্তির ভিত্তিতে ৮৪টি আসনের বিষয়ে শুনানি হয়। চারটি আসনে আইনি জটিলতায় নির্বাচন স্থগিত হলেও পরবর্তীতে এসব আসনে ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য ৮১টি স্থানীয় সংস্থা পর্যবেক্ষক হিসেবে নিবন্ধন করে, যাদের অধীনে মোট পর্যবেক্ষকের সংখ্যা ৫৫ হাজার ৪৫৪ জন। এছাড়া ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ), কমনওয়েলথ, আনফ্রেল, এনডিআই, আইআরআই পর্যবেক্ষক হিসেবে নির্বাচনী পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। বিদেশি পর্যবেক্ষকের সংখ্যা ছিল ৩৩০ জন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৯৯টি আসনে মোট প্রার্থী ছিল ২ হাজার ২৮ জন। এর মধ্যে ৫০টি রাজনৈতিক দলের প্রার্থী ১ হাজার ৭৫৫ জন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ২৭৩ জন। নির্বাচনে মোট নারী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৮১ জন। সংসদ নির্বাচনে ভোট প্রদানের হার ছিল ৫৯.৪৪ শতাংশ। বিএনপি ও জোটের মিত্র রাজনৈতিক দল ২১২টি আসনে জয় লাভ করে এবং জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ঐক্য ৭৭টি আসনে জয়লাভ করে। এছাড়া স্বতন্ত্র ও অন্যান্য দলের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ৮টি। বিজয়ী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা চলমান থাকায় চট্টগ্রাম-২ ও চট্টগ্রাম-৪ আসনের ফলাফল ঘোষণা স্থগিত রাখা হয়।

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ রাতে গণভোটের ফলাফল গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়। ১৩ দিন পর ২৫ ফেব্রুয়ারি গণভোটের ফলাফল সংশোধন করে সংশোধিত গেজেট প্রকাশ করে। সংশোধিত গেজেট অনুযায়ী গণভোটে মোট প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা ৭ কোটি ৬৬ লাখ ২১ হাজার ৪০৭টি যা মোট ভোটারের ৬০.১৯ শতাংশ। এর মধ্যে 'হ্যাঁ' ভোটে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ৪ কোটি ৭২ লাখ ২৫ হাজার ৯৮০ (৬১.৬৪ শতাংশ) এবং 'না' ভোটের সংখ্যা ২ কোটি ১৯ লাখ ৬০ হাজার ২৩১টি (২৮.৬৬ শতাংশ)। অন্যদিকে বাতিল ভোটের সংখ্যা ৭৪ লাখ ৩৫ হাজার ১৯৬টি যা গণভোটে প্রদত্ত ভোটের ৯.৭ শতাংশ।

নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের মধ্যে ইইউ-এর মতে ২০০৮ সালের পর এটিই প্রথম কোনো নির্বাচন যা আন্তর্জাতিক মহলে 'নির্ভরযোগ্য ও প্রতিযোগিতামূলক' নির্বাচন যা 'নতুন বেঞ্চমার্ক' বা মানদণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। টিআইবি মনে করে নির্বাচন মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হলেও তা সম্পূর্ণ সুষ্ঠু, প্রতিযোগিতামূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়নি। "বিজয়ী হতেই হবে" মানসিকতা এবং অর্থ, ধর্ম ও পেশিশক্তির অপব্যবহার নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করেছে। অপরদিকে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) বলেছে নির্বাচন আংশিকভাবে বিতর্কমুক্ত বলা গেলেও সম্পূর্ণ প্রশ্নাতীত তা বলা কঠিন।

ঘাটতি: নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্বেই কতিপয় রাজনৈতিক দলের সুপারিশের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন গঠন করার ফলে এর নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। আরপিও সংশোধনের ক্ষেত্রেও সমালোচনার সৃষ্টি হয়। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ (যেমন দলের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রায়ণ, আর্থিক স্বচ্ছতা) গ্রহণ না করে কেবল একক প্রার্থীর ক্ষেত্রে 'না' ভোটের বিধান রাখা হয়। জোট গঠন করলেও প্রতিটি দলকে নিজস্ব প্রতীকে নির্বাচন করার বাধ্যবাধকতা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ভিন্নমত ও বিতর্ক বিদ্যমান ছিল। নির্বাচনকে ঘিরে সহিংসতা, রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর হেনস্তা ও মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। সম্ভাব্য প্রার্থীরা হামলার শিকার হয় এবং তফসিল ঘোষণার পর ৩৬ দিনে সারা দেশে অন্তত ১৫ জন রাজনৈতিক নেতা-কর্মী হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। ২০২৫ সালে ৪০১টি রাজনৈতিক সহিংসতায় ১০২ জন নিহত হয়। এছাড়া ডিপফেক ও ভুল তথ্যের বাড়তি হুমকি এবং সংখ্যালঘুদের ওপর ৫০টির বেশি হামলা ও ঘটনার প্রেক্ষিতে জনমনে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। থানা থেকে লুট হওয়া ১,৩৩৩টি অস্ত্র উদ্ধার না হওয়া এবং নতুন করে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের অস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়ায় সহিংসতার ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারী মোট জনবলের মাত্র ৯ থেকে ১০ শতাংশ পুলিশ সদস্য ছিল, যা সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে বড় ঘাটতি হিসেবে দেখা দেয়।

মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তা, বিশেষ করে গত তিনটি নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাদের বাদ দেওয়া, উপদেষ্টাদের দলীয়করণ এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংশয় ও মতবিরোধ দেখা যায়। জামায়াত, এনসিপি এবং ইসলামী আন্দোলনের মতো দলগুলোর পক্ষ থেকে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা নিয়েও প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ৪৬টি আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ নিয়ে অসন্তোষ দেখা যায় এবং উচ্চ আদালতে অন্তত ২৭টি রিট আবেদন দাখিল হয়। প্রায় ১২,৫৩১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের অনুপযোগী ছিল। ইসি কর্তৃক প্রাথমিকভাবে বাছাই করা ৭৩টি পর্যবেক্ষক সংস্থার অনেকগুলোই 'নামসর্বস্ব' বা সক্ষমতাহীন বলে অভিযোগ উঠে। প্রার্থীর মনোনয়ন যাচাই-বাছাই, ঋণ খেলাপি ও দ্বৈত নাগরিকত্বের ভিত্তিতে প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো থেকে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ পাওয়া যায়। হলফনামায় দাখিলকৃত তথ্য যাচাই করার সক্ষমতা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ছিল না এবং কিছু ক্ষেত্রে থাকলেও তার পূর্ণ ব্যবহার করা হয়নি।

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের ব্যাপক প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। শোডাউন ও শোভাযাত্রা, অসময়ে প্রচারণা ও ডিজিটাল বিধি ভঙ্গ, অর্থ ও উপহার বিতরণ, জনভোগান্তি ও সহিংসতা, কার্যালয় দখল, এবং ভোটগ্রহণের দিন জাল ভোট ও ব্যালট ছিনতাইয়ের মত ঘটনা ঘটেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে জরিমানা, শোকজ নোটিশ, আটক ও দণ্ড দেওয়ার মত শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের শক্ত অবস্থান নেওয়ায় ঘাটতি ছিল। নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্ন হলেও জামায়াতের ৩০টি আসনে ভোট গণনায়

অনিয়মের অভিযোগ ছিল। পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর ছাড়া ফল ঘোষণা, ভুয়া এজেন্টের সই, পেনসিল দিয়ে ফল লেখার মত ঘটনা লক্ষ করা গেছে। তফসিল ঘোষণার পর ৬০ দিনে ২৩৭টি নির্বাচনী 'সহিংস' ঘটনায় নিহত হয়েছে ১৭ জন এবং আহত হয়েছে ১ হাজার ১০৯ জন। নিহতের ঘটনার মধ্যে পাঁচটিকে সরাসরি রাজনীতিসংশ্লিষ্ট বলে সরকার দাবি করে। সপ্রান-এর তথ্য অনুযায়ী নির্বাচনের পর ১৩ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সহিংসতায় ৫ জন নিহত ও ২২৬ জন আহত হয় এবং দেশের অন্তত ১৫টি স্থানে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। তফসিল ঘোষণার পর থেকে মোট ৫৪৫টি ভুল তথ্য শনাক্ত করা হয়। ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নির্বাচন-সংক্রান্ত ৭৫৭টি অপতথ্য শনাক্ত করে রিউমর স্ক্যানার। এছাড়া তফসিল ঘোষণার দিন থেকে ভোট গ্রহণের পরের এক সপ্তাহ পর্যন্ত সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানো ৫২৮টি অপতথ্যের ৪৫ শতাংশ ছিল ভোটসংশ্লিষ্ট (ডিসমিসল্যাব)।

নির্বাচন ও গণভোট উভয় ক্ষেত্রেই প্রযুক্তি, আইন ও প্রক্রিয়ায় বড় সংস্কার দেখা গেলেও নিরাপত্তা ঝুঁকি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে ভুল/অপতথ্য ছড়ানো ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। তবে নানা প্রতিকূলতা, অস্থিতিশীলতা, অসুস্থ নির্বাচনী প্রতিযোগিতা ও সার্বিকভাবে গণতান্ত্রিক উত্তরণের সম্ভাবনা নিয়ে আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও সফল ও মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হয়।

৪. অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধ

অগ্রগতি: অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সংস্কারের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ বাতিল করা অন্যতম। কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট রেগুলেশন, ২০২৫-এর মাধ্যমে বাণিজ্যভিত্তিক অর্থপাচার রোধ (Trade-based Money Laundering), এবং ট্যাক্স ফাঁকি ও সংগঠিত অর্থ অপরাধ ঠেকাতে শুল্কে ইন্টেলিজেন্স/ডেটা-ড্রিভেন রিস্ক কন্ট্রোল চালু করা হয়। এই সময়ে দুর্নীতি/অর্থপাচার অপরাধের বিচারিক কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)-কে ঢেলে সাজাতে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এর স্বতন্ত্র কার্যকরতা নিশ্চিত করা হয়। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ সেল স্থাপন করা হয়।

বাংলাদেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবস্থার শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি প্রণীত প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদী সরকারের সময় প্রকৃত লুণ্ঠনের চিত্র প্রকাশ পায়। শ্বেতপত্র প্রতিবেদন অনুসারে, ২০০৯-২০২৪ সালের মধ্যে মোট প্রায় ২৩৪ বিলিয়ন ডলার বিদেশে পাচার করা হয়। সাতটি বৃহৎ প্রকল্পে ৭০ শতাংশ অতিরিক্ত ব্যয়ের তথ্য পাওয়া যায়। জিডিপি এবং মাথাপিছু আয়ের তথ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক কারসাজির চিত্র প্রকাশ পায়। কর্তৃত্ববাদী সরকারের আমলে সংঘটিত দুর্নীতির অভিযোগে ৫৬৮টির বেশি দুর্নীতিবিরোধী মামলা দায়ের করা হয় এবং এসব মামলায় আসামি বা অভিযুক্তের সংখ্যা ছিল ২,৭০০ জনের বেশি। প্রায় ১,২০০টির বেশি অভিযোগের গভীর অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা চলমান ছিল। মোট ২৬৭টি মামলার নিষ্পত্তি হয়, যার মধ্যে ১৩৪টিতে আসামিদের সাজা প্রদান করা হয় এবং ১৩৩টিতে অভিযুক্তদের খালাস দেওয়া হয়। এছাড়া ৩১৫টি মামলায় ১,০৭৮ জন আসামির বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়। অন্তর্বর্তী সময়ে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক মিলিয়ে মোট ৬৬,১৪৬ কোটি টাকা মূল্যমানের অর্থ ও সম্পদ ফ্রিজ বা জব্দ করা হয়। এর মধ্যে যুক্তরাজ্যে প্রায় ২৬০ মিলিয়ন পাউন্ড (প্রায় ৩,৬৪০ কোটি টাকা) অর্থমূল্যের সম্পদ জব্দ করা হয়।

সরকারের অভ্যন্তরীণ স্বচ্ছতা ও নৈতিকতার চর্চার দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা যায় যে, কয়েকজন উপদেষ্টার ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে তাদের তাৎক্ষণিকভাবে অব্যাহতি প্রদান করাসহ দুদকের মাধ্যমে তদন্তের নির্দেশ প্রদা এবং বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এ সময়ে পাচারকৃত সম্পদ উদ্ধারে রোডম্যাপ ২০২৫ চূড়ান্ত করা হয়। পাচারকৃত অর্থের সাথে জড়িত ১১টি নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও শিল্প গ্রুপকে চিহ্নিত করে পাচারকৃত সম্পদ উদ্ধারের প্রচেষ্টা হিসেবে আন্তর্জাতিক ১২টি ল' ফার্ম নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাচারকৃত অর্থ-সম্পদ উদ্ধারে ২১টি দেশে আনুষ্ঠানিক অনুরোধ (Mutual Legal Assistance Request) পাঠানো হয়। বিএফআইইউ ও যৌথ টিমের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পরিবার ও ব্যক্তিবর্গের একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্টে হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ, প্লট, ফ্ল্যাট ও বাড়ি ফ্রিজ করা হয়। আইনি পদক্ষেপ হিসেবে বিদেশে পাচারকৃত সম্পদ অ্যাটাচমেন্টের জন্য এমএলএআর শুরু করা হয়। বাংলাদেশ থেকে পাচারকৃত সম্পদ নিয়ে আন্তর্জাতিক মাধ্যমেও মনোযোগ বৃদ্ধি পায়। যুক্তরাজ্যে 'বাংলাদেশের মিসিং বিলিয়নস' নিয়ে আলোচনা লক্ষ করা যায় এবং এ সংক্রান্ত কূটনৈতিক পর্যায়েও আলোচনা হয়। বাংলাদেশের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইসি) বিদেশে অবস্থিত প্রায় ৪০,০০০ কোটি টাকার (প্রায় ৪০০ বিলিয়ন বাংলাদেশি টাকা বা ৩.৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি) সম্পদ শনাক্ত করে, যা বাংলাদেশ থেকে পাচারকৃত অর্থ ব্যবহার করে কেনা হয়েছিল।

ঘাটতি: অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধে বিভিন্ন ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে, বিশেষ করে দুদক সংস্কার কমিশনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ উপেক্ষা করা হয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের (আইনসভা, নির্বাহী, বিচার বিভাগ, সরকারি ক্ষেত্র, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, নির্বাচন কমিশন, ন্যায়পাল, নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান, দুদক, স্থানীয় সরকার, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ এবং কর্পোরেট খাত) দুর্নীতিবিরোধী ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে একটি জাতীয় দুর্নীতিবিরোধী কৌশল (NACS) গ্রহণ করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। জাতীয় দুর্নীতিবিরোধী কৌশলের অধীনে প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মক্ষমতা তদারকি এবং প্রতিবেদন নিশ্চিত করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ন্যায়পালের কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব উপেক্ষা করা হয়। কালো টাকা বৈধ করার চর্চা

স্থায়ীভাবে বাতিল করার জন্য প্রত্যাশিত নির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা হয়নি। বিভিন্ন স্তরে ক্ষমতাধর এবং জনস্বার্থ-সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি এবং প্রতিরোধ করার জন্য নির্দিষ্ট আইনি কাঠামো তৈরি করা হয়নি। জনসাধারণের অর্থ ও সম্পদ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে কোম্পানি, ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশনের মালিকানার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রতারণা রোধ করার জন্য এবং জনসাধারণের জন্য প্রবেশযোগ্য রেজিস্টারের মাধ্যমে এই ধরনের লাভজনক মালিকানার বাধ্যতামূলক প্রকাশের বিধান থাকার নিশ্চয়তা দিয়ে 'প্রকৃত মালিকানা স্বচ্ছতা আইন' (Beneficial Ownership Transparency Act) প্রণয়নের সুপারিশ করা হলেও তা প্রণয়ন করা হয়নি।

রাজনৈতিক ও নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট আইনি বিধান তথা সকল স্তরের জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই তাদের এবং পরিবারের সদস্যদের বার্ষিক হালনাগাদযোগ্য খাতভিত্তিক আয় এবং সম্পদের বিবরণী জমা দেওয়া এবং জনসাধারণের যাচাই-বাছাইয়ের জন্য নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় বিধিবিধান প্রণয়ন করা হয়নি। কর ফাঁকি এবং অর্থ পাচারসহ অবৈধ আর্থিক স্থানান্তর রোধের উপায় হিসেবে দেশে এবং বিদেশে সকলের আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য কর সংক্রান্ত বিষয়ে 'মিউচুয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্স ইন ট্যাক্স ম্যাটার কনভেনশনে (MCAA)' বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি এবং 'কমন রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (CRS)' বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। সরকারি, বেসরকারি এবং অরাষ্ট্রীয় খাতে স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চা গ্রহণের সুবিধা সত্ত্বেও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়ভাবে 'ওপেন গভর্নমেন্ট পার্টনারশিপের (OGP)' পক্ষভুক্ত হয়নি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি বিস্তৃত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ ছিল যার মধ্যে ছিল স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা, যাতে সৃজনশীল উপায়ে জনগণ এবং নতুন প্রজন্মকে এই ধারণাটি জানানো যে দুর্নীতি কেবল একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়, বরং এটি একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয়ভাবে অগ্রহণযোগ্য, ধ্বংসাত্মক এবং বৈষম্যমূলক ব্যাধি। কিন্তু এই বিস্তৃত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

সংস্কারের বিষয়ে জনমনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকলেও সরকার ও দুদক সংস্কারে 'আশু করণীয়' পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নে এবং সার্বিকভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধে অন্যান্য প্রস্তাব বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। দুদকে দুর্নীতির সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও তাদের অভ্যন্তরীণ সুশাসন নিশ্চিতে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। "হাই-প্রোফাইল" বা শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু হলেও এর অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক ছিল না। সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত দক্ষতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও সমন্বয়ের অভাবে এবং আন্তর্জাতিক আইনি প্রক্রিয়ার জটিলতা মোকাবিলায় উপযুক্ত কৌশলের ঘাটতির কারণে পাচারকৃত টাকা দেশে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সরকার যেভাবে অশাবাদী ঘোষণা দিয়েছিল তার বাস্তবায়নে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। অন্যদিকে কর ফাঁকি, বৃহৎ দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের পাশাপাশি সেবাখাতে ঘুষ আদায়, চাঁদাবাজি, দখলবাজি, মামলা-বাণিজ্য, গ্রেফতার-বাণিজ্য, জামিন-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি প্রতিরোধেও কোনো দৃশ্যমান ও ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গ্রহণের চিত্র দেখা যায়নি। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের আয় ও সম্পদের বিবরণী জনগণের সামনে প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি ও নীতিমালা করা হলেও তাদের আয় ও সম্পদের হিসাব জনগণের সামনে অন্তর্বর্তী সরকারের শেষ মুহূর্তে প্রকাশ করা হয়। সরকারি কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব নেওয়া হলেও তা যাচাই-বাছাইয়ের কোনো উদ্যোগ না নেওয়ায় এই নির্দেশনার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে।

আগের তুলনায় দুদকের কার্যক্রমে দৃশ্যমান সক্রিয়তা দেখা দিলেও পরিস্থিতির গুণগত উন্নয়ন আশাব্যাঞ্জক ছিল না। অন্তর্বর্তী সময়ে দুদক সরকারের ও বিশেষ করে আমলাতান্ত্রিক প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। মামলা দায়ের ও প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ ছিল। দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে পুরনো ধারা বিদ্যমান ছিল – ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ক্ষমতার বাইরে থাকা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অনেকক্ষেত্রে সরকারের প্রশ্নবিদ্ধ পদক্ষেপের সহায়ক হিসেবে দুদকের ব্যবহৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। একদিকে দুদক সংস্কার কমিশনের আশু করণীয় সুপারিশমালা সরকার বা দুদকের নিকট প্রত্যাশিত গুরুত্ব না পাওয়া, অন্যদিকে অন্য কোনো অংশীজনকে সম্পৃক্ত না করে দুদক ও সরকারি আমলাতন্ত্রের একচ্ছত্র কর্তৃত্বে দুদকের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার পাশাপাশি জবাবদিহির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সুপারিশ উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। যদিও দুদক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশের এই সুপারিশের ক্ষেত্রে দুদকের শীর্ষ কর্তৃপক্ষের যেমন কোনো দ্বিমত ছিলো না তেমনি জুলাই সনদ অনুযায়ী প্রায় সকল রাজনৈতিক দলেরও নোট অফ ডিসেন্টহীন সম্মতি ছিল, যা সরকার বা দুদক কারোরই অজানা ছিল না।

৫. খাতভিত্তিক উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ

ক. জনপ্রশাসন

অগ্রগতি: অন্তর্বর্তী সময়ে জনপ্রশাসনে ব্যাপক প্রশাসনিক রদবদল হয়। ২০২৪-২৫ সময়কালে পতিত সরকারের সময় দলীয় বিবেচনায় বঞ্চিত বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ১,৫৪৯ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেওয়া হয়। এর মধ্যে ছিল অনুমোদিত পদের বাইরে সুপারনিউমারারি পদোন্নতি এবং ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি। এছাড়া অনেককে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান, এবং বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়। এ সময়ে স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা রক্ষায় বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করা হয়, যার মধ্যে ছিল কর্মকর্তাদের চাকরি-সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদকরণ, সরকারি কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব দেওয়া, যোগাযোগমাধ্যমে অভ্যন্তরীণ আদান-প্রদান করা যে কোনো সরকারি তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং বিদেশে সরকারি সফরে বাধা-নিষেধ প্রদান করা,

ইত্যাদি। সরকারি কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা হিসেবে ১০ শতাংশ প্রণোদনা বৃদ্ধি করা হয়, যা ১ জুলাই ২০২৫ থেকে কার্যকর হয়। এর পাশাপাশি পেনশনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ ভাতা দ্বিগুণ করা হয়।

ঘাটতি: জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের ২০৮টি সুপারিশের মধ্যে মাত্র ১৮টি 'অতি জরুরি' হিসেবে চিহ্নিত করে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হলেও তিনটি সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়, যার মধ্যে রয়েছে শৌচাগার সংস্কার, ভেরিফিকেশন ছাড়া পাসপোর্ট প্রাপ্তি ও গণশুনানি। সংস্কার কমিশনের অনেক সুপারিশ বাদ দিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিজেদের পছন্দমতো প্রস্তাব যুক্ত করে, যেখানে আমলাতন্ত্রের স্বার্থরক্ষার অভিযোগ উঠে। অনুমোদিত ৩,৬৯৬টি পদের চেয়ে প্রশাসনে প্রায় দ্বিগুণ কর্মকর্তা (৬,৫৩৫ জন) বিদ্যমান ছিল। পদোন্নতি পাওয়া বা পদবঞ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুসরণে ব্যর্থতার অভিযোগ ছিল। অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও যোগ্যতার চেয়ে 'বঞ্চিত' হওয়াকে অগ্রাধিকার প্রদান এবং রাজনৈতিক আনুগত্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, যদিও নিজেদের বঞ্চিত দাবি করা অনেকের বিরুদ্ধে আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ ছিল। অন্যদিকে পদোন্নতিপ্রাপ্তদের মধ্যে কারও কারও বিরুদ্ধে অতীতে দুর্নীতি-অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত থাকা, বিভাগীয় মামলায় শাস্তিপ্রাপ্ত, এবং আওয়ামী লীগের নানা অপকর্মের সহযোগী বলে অভিযোগ ছিল। অন্তর্বর্তী সরকার প্রশাসনে চুক্তিতে নিয়োগ না করার ঘোষণা করলেও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ অব্যাহত ছিল। এ ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্তদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ নিয়ে গত সরকারের আমলে বঞ্চিত ও পদোন্নতিপ্রত্যাশী কর্মকর্তাদের মধ্যে হতাশা ছিল। বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাবি-দাওয়ার আন্দোলনও চলমান ছিল।

জনপ্রশাসনে বিশৃঙ্খলা ও সিদ্ধান্তহীনতা চলমান ছিল যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে। সংস্কারের বিরোধিতা ও সুযোগ-সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনের স্বার্থ রক্ষাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়ার চিত্র দেখা যায়। প্রশাসনকে দলীয়মুক্ত করার ক্ষেত্রে সরকার ব্যর্থ হয় বরং কর্তৃত্ববাদী আমলের একচেটিয়া দলীয়করণের স্থলে দ্বি-দলীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পায়। প্রশাসনে জনপ্রশাসন ক্যাডারের প্রভাব ঝুঁকিপূর্ণ মাত্রায় অব্যাহত ছিল। আন্তঃক্যাডার ও গ্রেডভিত্তিক বৈষম্য, পদোন্নতিতে বৈষম্য, বৈষম্যের শিকার সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন দমনে বলপ্রয়োগ, উদ্দেশ্যমূলক অধ্যাদেশ প্রণয়ন, এবং অনেক ক্ষেত্রে দুদক কর্তৃক হয়রানি ছিল উল্লেখযোগ্য। উপযুক্ত কর্মকর্তা না থাকার পরও প্রশাসন ক্যাডারের পদ প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হয়। জনপ্রশাসনে পেশাদারিত্বের ঘাটতি বিদ্যমান ছিল। বিভিন্ন আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ বা দমনে সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর অবস্থান গ্রহণে ব্যর্থতা লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে সরকারের তোষণমূলক নমনীয়তা দৃশ্যমান ছিল।

খ. বিচার বিভাগ

অগ্রগতি: বিচারকদের পদায়ন, বদলি ও নিয়ন্ত্রণে প্রধান বিচারপতির ক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ 'সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারির মাধ্যমে পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিচার বিভাগ সংস্কারের ক্ষেত্রে অন্যান্য অগ্রগতির মধ্যে ছিল 'সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল' গঠন; 'জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিল' গঠন ও উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগ; বিচারকদের বদলি-পদোন্নতির নীতিমালা প্রণয়ন; এবং দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা। অন্যদিকে মামলার নিষ্পত্তি বাড়াতে পৃথক আদালত স্থাপন ও পদ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দেশের সব জেলায় পৃথক বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালত গঠনের নির্দেশনা দেওয়া হয়। বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিরোধ দ্রুত ও কার্যকরভাবে নিষ্পত্তি করতে দেশে প্রথম বিশেষায়িত বাণিজ্যিক আদালত প্রতিষ্ঠা করার জন্য অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এছাড়া বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের সম্পদের হিসাব জমা দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

ঘাটতি: আইন কর্মকর্তাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনার অভিযোগ ছিল। নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারকদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ঘাটতি ছিল যার ফলে মামলা নিষ্পন্ন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা দেখা গেছে। কিছু ক্ষেত্রে বিচার প্রক্রিয়ায় অনিয়মও দেখা গেছে। গণহারে আটক ও জামিন, শীর্ষ সন্ত্রাসীদের জামিন নিয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকেও অভিযোগ করা হয়। বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নির্বাহী বিভাগের সদিচ্ছার ঘাটতি এবং অসহযোগিতা অব্যাহত ছিল। বিচার বিভাগের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও চর্চার ক্ষেত্রে ঘাটতি বিদ্যমান ছিল। সংস্কারের বাস্তব সাফল্য ও স্থায়িত্ব নিয়ে যৌক্তিক উদ্বেগ অব্যাহত থাকাসহ বিচার বিভাগে রাজনৈতিক দলীয়করণের প্রবণতা চলমান ছিল। বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের দলীয়করণ ন্যায়বিচারসহ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসেবে বিদ্যমান ছিল।

গ. আইন-শৃঙ্খলা

অগ্রগতি: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হয়। ২০২৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত সকল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমন্বয়ে 'অপারেশন ডেভিল হান্ট' পরিচালনা করা হয়। এই ২১ দিনে সারাদেশে ১২ হাজার ৫০০ জনকে গেপ্তার করা হয়। শহীদ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে ২০২৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর থেকে 'অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২' এর আওতায় ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত সারা দেশে মোট ২২ হাজার ৪৬৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। কোনো কোনো শীর্ষ সন্ত্রাসী এ সময় গ্রেপ্তার করা হয়। অন্যদিকে কোনো কোনো 'মব' ও সহিংসতা ঘটনার পর সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার করা হয়। ২০২৫ সালের মার্চ মাসে ডিএমপির আট অপরাধ বিভাগের উপকমিশনারের কার্যালয়ে আটটি স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত চালু করা হয় এবং আদালত কর্তৃক ডিসেম্বর ২০২৫ সাল পর্যন্ত ৯ হাজার ৫৮৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

ঘাটতি: কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের সময় থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের পুরো মেয়াদেই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছিল নাজুক। খুন, ডাকাতি, চুরি, ছিনতাই, ধর্ষণ, নারী ও শিশু নির্যাতন, আন্দোলন, লুটপাট, অরাজকতা অব্যাহত ছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা আগস্ট ২০২৪ থেকে দুই মাস করে বাড়িয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত করা হয়। এই সময়ে উচ্ছৃঙ্খল জনতার ('মব') আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনার আশংকাজনক বৃদ্ধি পায়। 'মব' তৈরি করে দাবি আদায়ের প্রবণতাসহ অনেকক্ষেত্রে বলপূর্বক দাবি আদায়ে সাফল্য দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে মবকে মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট কৌশল বা পদক্ষেপের ব্যর্থতা দৃশ্যমান ছিল। এমনকি নিষ্ক্রিয়তা ও তোষণমূলক অবস্থানের কারণে 'মব' সৃষ্টিকারীদের অতি-ক্ষমতায়িত করা হয়। অন্তর্বর্তী সময়ে ঢালাওভাবে মামলায় আসামী হিসেবে নাম দেওয়া; গ্রেপ্তার বাণিজ্য; রাজনৈতিক চাপ বাড়লে গ্রেপ্তার বৃদ্ধির অভিযোগ; বিচারবহির্ভূত হত্যা এবং কারা ও সেনাবহিনীর হেফাজতে অব্যাহত মৃত্যু; এবং সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর অব্যাহত হামলার দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। সামাজিক অসহনশীলতা রোধে সরকারের উদাসীনতা দৃশ্যমান ছিল। পাশাপাশি দাবি আদায়ে বারবার সড়ক অবরোধের প্রবণতা দেখা গেছে। এই ধরনের আন্দোলন রোধে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ ছিল। আন্দোলন দমন করতে পুলিশের কার্যক্রমেও বৈষম্য লক্ষ করা গেছে – কোনো পক্ষের প্রতি পুলিশ নমনীয় আচরণ করেছে, আবার কোনো পক্ষের আন্দোলন দমন করতে বলপ্রয়োগ করা হয়েছে।

পুলিশের সংস্কার রদবদল, পদোন্নতি, বদলি, চাকরি থেকে অব্যাহতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পুলিশ কমিশন গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও যে অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয়েছে সে অনুযায়ী কমিশন গঠিত হলে তা পুরোপুরি অকার্যকর একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে পুলিশের নির্লিপ্ততা ও দায়িত্ব পালনে অনাগ্রহ দৃশ্যমান ছিল। পেশাদারিত্বের ঘাটতি এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনীকে বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দেওয়া হলেও তা প্রত্যাশিত পর্যায়ে ফলপ্রসূ হয়নি। নারী, আদিবাসী, ধর্মীয় ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের সহিংস অধিকার হরণ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে সরকারের অবস্থান প্রশ্নবিদ্ধ ও অস্বচ্ছ ছিল, এবং সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের কারণে জেন্ডার, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য হুমকির মুখে মুখে পড়ে।

ঘ. আর্থিক খাত

অগ্রগতি: ব্যাংক খাতের সংস্কারের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির মধ্যে ব্যাংক সম্পদের গুণগত মান পর্যালোচনা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং চুরি যাওয়া সম্পদ উদ্ধারসহ খেলাপি ঋণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য তিনটি টাস্কফোর্স গঠন করা অন্যতম। ব্যাংক খাতকে দুর্নীতিমুক্ত করতে পরিবার ও রাজনৈতিক প্রভাবে থাকা ১২টি বেসরকারি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করা হয়। এছাড়া আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী ব্যাংক নীতিমালা সংস্কার; পাঁচটি দুর্বল ব্যাংক একীভূত করে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক গঠন; ছয়টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা; এবং ক্ষুদ্রঋণ খাতের বিধিমালা সংশোধন করা হয়। এর ফলে ২০২৫ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ব্যাংক আমানতের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১০.৮০ শতাংশে যা এর পূর্বের ২০ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে ছিল সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি, নীতিসুদ বৃদ্ধি, বিনিময় হার স্থিতিশীলকরণ, ভোগ্যপণ্যে শুল্ক ও এলসি মার্জিন শিথিলকরণ এবং খাদ্য-সার আমদানিতে ঋণসুবিধার উদ্যোগ গ্রহণ করা। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে যেখানে গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ১০.৮৯ শতাংশ ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে তা কমে দাঁড়ায় ৮.৪৯ শতাংশ।

আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করে খেলাপি ঋণের সংজ্ঞা পরিবর্তনের ফলে খেলাপি ঋণের প্রকৃত চিত্র প্রকাশিত হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে খেলাপি ঋণের হার ১২.৫৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত এই হার হয় ৩৫.৭৩ শতাংশ। বিদেশে অর্থ পাচার ও সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগে ৩৭৮ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের ২,৫০০টি ব্যাংক হিসাবের ১৬ হাজার কোটি টাকা জব্দ করা হয় এবং আগস্ট ২০২৪ সাল থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সাল পর্যন্ত এ সংশ্লিষ্ট মামলা হয় ১১৫টি। পাশাপাশি ৩০০ প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানকে ঋণ পুনঃতফসিলের সুযোগ দেওয়া হয়। অন্যদিকে শ্রম খাতে সরকার আইএলও'র তিনটি কনভেনশন স্বাক্ষর করে এবং ২০ জন শ্রমিকেই ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের বিধান রেখে শ্রম আইন সংশোধন করে।

রাজস্ব ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকার বেশকিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে এনবিআর থেকে রাজস্ব নীতি বিভাগ পৃথক করা; অনলাইনে আয়কর রিটার্ন বাধ্যতামূলক করা; কর অটোমেশন, অনলাইন ভ্যাট রিফান্ড ও কর অডিট নির্দেশিকা জারি করা; ১২টি কমিশনারেট ও ৩,৫৯৭টি নতুন পদ সৃষ্টি করা; গ্রিন চ্যানেলে আমদানি-রপ্তানি সুবিধা দেওয়া; এবং প্রথম বিশেষায়িত বাণিজ্যিক আদালত প্রতিষ্ঠা করা। এসব ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে প্রায় ৩,৩০০ প্রবাসী আয়কর রিটার্ন দাখিল করে। অন্যদিকে ২০২৫ সালে চট্টগ্রাম বন্দরের রাজস্ব আয় আগের বছরের তুলনায় ৭.৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫,৪৬০ কোটি ১৮ লাখ টাকা হয়।

সরকারের রিজার্ভ, বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি বজায় ছিল। সরকার ২০২৪-২৫ অর্থবছর থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ছয়মাস পর্যন্ত মোট বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করে ৬২৮ কোটি ৫০ লাখ ডলার। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ তিন বছর পর প্রথমবারের মতো ব্যালেন্স অব পেমেন্ট (বিওপি) উদ্বৃত্ত হয়, যার পরিমাণ ৩.৪ বিলিয়ন ডলার (৩৪০ কোটি ডলার) এবং একই সময়ে বাণিজ্যঘাটতি হ্রাস পায় ৯.১ শতংশ। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সময় রিজার্ভ ২০ বিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি

পেয়ে জানুয়ারি ২০২৬-এ ২৮.০৭ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে প্রবাসী আয়ও বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত দাঁড়ায় ৪৪.৬৯ বিলিয়ন ডলার।

ঘাটতি: আর্থিক খাতে কিছু ইতিবাচক অগ্রগতি হলেও প্রকৃত সংস্কারে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক সংশোধন অধ্যাদেশ অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রতা দেখা গেছে। অন্যদিকে অর্থনীতির সংস্কার সংক্রান্ত শ্বেতপত্রের সুপারিশগুলোও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কঠোর ঋণনীতি, উচ্চ সুদ ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে বেসরকারি বিনিয়োগ স্থবির ছিল। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বিদেশি বিনিয়োগ ছিল ৬৭ কোটি ডলার এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫৫ কোটি ডলারে নেমে আসে (১৭ শতাংশ কম) যা পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন ছিল। কাস্টমস বন্ড অটোমেশন ও নতুন অনলাইন ভ্যাট রিফান্ড ব্যবস্থা চালু হলেও ব্যবসায়ীরা এই অটোমেশন পদ্ধতির ত্রুটি ও নানাবিধ শর্তের বেড়াজালের কারণে কাঙ্ক্ষিত মাত্রার সুফল পায়নি।

অন্তর্বর্তী সময়ে রাজস্ব ঘাটতিও অব্যাহত ছিল। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রাজস্ব ঘাটতি ছিল ৯২ হাজার ৬২৬ কোটি টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে জুলাই-ডিসেম্বর এই ছয় মাসে রাজস্ব ঘাটতি ছিল ৬৮ হাজার ৯৯৫ কোটি টাকার। এ সময় সর্বনিম্ন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বরাদ্দের ৬৭.৮৫ শতাংশ এডিপি বাস্তবায়ন হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) বরাদ্দের মাত্র ১৭.৫৪ শতাংশ বা ৪১ হাজার ৮৭৬ কোটি টাকার এডিপি বাস্তবায়ন হয়। অন্যদিকে জাতীয় বাজেটে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়। মূল্যস্ফীতি হ্রাসের ক্ষেত্রে প্রাথমিক সাফল্য থাকলেও প্রত্যাশিত পর্যায়ে হ্রাস না পাওয়ায় দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়। এর পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দ হ্রাস এবং কারখানা বন্ধ ও শ্রমিকের চাকরিচ্যুতির কারণে দারিদ্র্য পরিস্থিতি আরও নাজুক হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। সরকারের পরিচালনা ব্যয়ের তুলনায় উন্নয়ন ব্যয় হ্রাস পায়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সরকারি ব্যয় হয় ৬ লাখ ২৫ হাজার ৯১৪ কোটি টাকার যেখানে পরিচালন খাতে খরচ হয় ৭৬ শতাংশ বা ৪ লাখ ৭৪ হাজার ১৪৩ কোটি এবং উন্নয়ন খাতে ব্যয় হয় ১ লাখ ৫১ হাজার ৭৭১ কোটি টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে পরিচালনা খাতে ব্যয় হয় ৩৫.৩৩ শতাংশ বা ৩১ হাজার ৮০০ কোটি টাকা।

২০২৫ সালের জুলাইয়ের পর থেকে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ক্রমাগত কমে নভেম্বরে দাঁড়ায় ঋণাত্মক ৫.৫ শতাংশ। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) তৈরি পোশাক রপ্তানি গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় কমে ২.৬৩ শতাংশ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে সিন্ডিকেটের প্রভাবও অব্যাহত ছিল বিশেষ করে এলপিজি'র সরবরাহ স্বল্পতায় বাজার সিন্ডিকেটের কারণে এর মূল্য ছিল ঊর্ধ্বগতি যার প্রভাব পড়েছে বাসাবাড়ি ও হোটেল, রেস্টুরেন্টের জ্বালানি খরচের ওপর। এছাড়া আদালতে বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও সরকার নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) কনসেশন চুক্তি মাত্র ১২ দিনে সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেয় যার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। অন্যদিকে টাকা ছাপানো বন্ধের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও টাকা ছাপানো বন্ধ না করে টাকা ছাপিয়ে দুর্বল ব্যাংকগুলোর তারল্য সংকট মোকাবিলায় বরাদ্দ দেওয়া হয়।

ঙ. শিক্ষা

অগ্রগতি: শিক্ষা খাতের অগ্রগতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের সুপারিশ প্রণয়নে সার্চ কমিটি গঠন; বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ, এবং এর মধ্যে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচন সম্পন্ন; বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নতুন অ্যাডহক বা অস্থায়ী কমিটি গঠনের নির্দেশনা এবং পরবর্তীতে ৩০ নভেম্বর ২০২৫ এর মধ্যে নিয়মিত গভর্নিং বডি গঠনের নির্দেশ; বেসরকারি কলেজে অ্যাডহক কমিটির সভাপতির শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ; সরকারি প্রাথমিক প্রধান শিক্ষকদের গ্রেড একধাপ উন্নীতকরণ; এবং বেসরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ এনটিআরসি'র মাধ্যমে করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

ঘাটতি: শিক্ষা খাতে কাঠামোগত দুর্বলতা ও পর্যাপ্ত বাজেটের ঘাটতি অব্যাহত ছিল। পদত্যাগ বা অপসারণের পরিপ্রেক্ষিতে ৪৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করা হলেও উপাচার্য নিয়োগের মানদণ্ড ও স্বচ্ছতা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। দুইটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের ভাগাভাগি করে উপাচার্য নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ ছিল। শিক্ষা খাতসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেও শিক্ষার্থী ও 'জনতা'র চাপে পরে বাতিল করার দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়, যার মধ্যে রয়েছে পাঠ্যপুস্তকের লেখা ও আদিবাসী সংশ্লিষ্ট গ্রাফিতির চিত্র পরিবর্তন; শিক্ষক নিয়োগ পদায়ন ও অপসারণ; এবং বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজ সমন্বয়ের লক্ষ্যে গঠিত সমন্বয় কমিটি বাতিল। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের দাবিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক আন্দোলন এবং ছাত্র সংসদের সদস্য কর্তৃক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হেনস্তা করা হয়। অন্যদিকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণেও বিলম্ব হয়।

চ. স্বাস্থ্য

অগ্রগতি: স্বাস্থ্য খাতে অগ্রগতিগুলোর মধ্যে ছিল কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রণোদনা প্রদান; সাত হাজার চিকিৎসককে পদোন্নতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ; ট্রেইনি চিকিৎসকদের ভাতা ৩০ শতাংশ বাড়িয়ে ৩৫ হাজার টাকা করার সিদ্ধান্তগ্রহণ; ওষুধ সহজে পাওয়ার লক্ষ্যে সারা দেশে 'ফার্মেসি নেটওয়ার্ক' গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ; এবং প্রাথমিকভাবে সারাদেশে সরকারি ৭০০ হাসপাতালে এই ফার্মেসি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকায় ১৩৫টি নতুন ওষুধ যুক্ত করে মোট ২৯৫টিতে উন্নীত করা হয়।

ঘাটতি: স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশনের ৪০০ এর ওপরে সুপারিশের মধ্যে ৩৩টি আশু করণীয় হলেও বাস্তবায়িত হয় মাত্র ছয়টি। এ সময় জনসাধারণের চিকিৎসা ব্যয় বৃদ্ধি পায়। একাধিক চিকিৎসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য প্রশাসন, চিকিৎসা শিক্ষা ও জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগ বাতিল, বদলি ও পদায়নে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ উঠে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতা ছিল, এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ক্রয় প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি অব্যাহত ছিল।

ছ. স্থানীয় সরকার

অগ্রগতি: সব পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি অপসারণ এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়।

ঘাটতি: স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের ১৮০টি সুপারিশের মধ্যে ৬০টি আশু করণীয় হলেও একটিও বাস্তবায়ন হয়নি। জনপ্রতিনিধির অনুপস্থিতিতে সেবা প্রদান বিঘ্নিত হয় ও জনগণের দুর্ভোগ চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি অব্যাহত ছিল এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে মেয়র নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন ও আইন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের ঘাটতি ছিল। এ সংক্রান্ত আন্দোলন নিয়ন্ত্রণেও সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।

জ. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

অগ্রগতি: অন্তর্বর্তী সময়ে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের বিতর্কিত 'দ্রুত সরবরাহ আইন' বাতিল করা হয়। এছাড়া অন্যান্য অগ্রগতির মধ্যে ছিল বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)-এর ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করা; নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা ২০২৫ প্রণয়ন করা; এবং এসপিএম টার্মিনালে উন্মুক্ত দরপত্রের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ঘাটতি: বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্যাপাসিটি চার্জ পুনর্মূল্যায়নের উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে কোনো বৈষম্যমূলক চুক্তি বাতিল করা হয়নি। কোনো অংশীজনকে সম্পৃক্ত না করেই ২০২৬ থেকে ২০৫০ সালের জন্য জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়, যেখানে চাহিদার প্রাক্কলন, জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর অত্যধিক আমদানিনির্ভরতা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

ঝ. পরিবেশ

অগ্রগতি: অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে পরিবেশ বিষয়ক বেশ কিছু অগ্রগতি হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে পলিথিন নিষিদ্ধ করা; নিরাপদ পানীয় জলকে সাংবিধানিক অধিকার ঘোষণা; শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ গ্রহণ করা; এবং পরিবেশ সংকটাপন্ন এলাকায় টেকসই পর্যটনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ঘাটতি: নদী দূষণ, নদী দখল, বন ধ্বংস, শিল্পবর্জ্য দূষণ ও বায়ু দূষণ প্রতিরোধে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। এছাড়া পাথর কোয়ারি বন্ধে ব্যর্থতাসহ কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবেশ রক্ষায় সরকারের পরস্পরবিরোধী আচরণও লক্ষ করা গেছে।

ঞ. বৈদেশিক কর্মসংস্থান

অগ্রগতি: বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় যার মধ্যে রয়েছে অভিবাসন প্রক্রিয়া সহজতর করা; অভিবাসন ব্যয় কমাতে এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে 'ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট প্ল্যাটফর্ম' (ওইপি) চালু করা; অনলাইনে বিএমইটি ছাড়পত্র ইস্যু করা; এবং ঢাকার হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে 'প্রবাসী লাউঞ্জ' ও 'ওয়েটিং লাউঞ্জ' চালু করা। এছাড়া মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রেও অগ্রগতি ছিল। পাশাপাশি অন্যান্য কয়েকটি দেশ যেমন ইতালি, জাপানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরসহ রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রক্রিয়া সহজতর করা ও প্রণোদনা বৃদ্ধি করা হয়।

ঘাটতি: রেমিট্যান্স প্রাপ্তিতে ব্যাপক অগ্রগতি হলেও বৈদেশিক কর্মসংস্থানে অবনতি দেখা গেছে। দালাল ও সিন্ডিকেট বা চক্রের কারণে নির্ধারিত খরচের চেয়ে বিদেশগামীদের কয়েক গুণ বেশি টাকা ব্যয় করতে হয়েছে। বৈধ পথে সুযোগের অভাব এবং দালালদের প্ররোচনায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার প্রবণতা অব্যাহত ছিল।

ট. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

অগ্রগতি: বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ এবং গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রতি বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সমর্থন অব্যাহত ছিল। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান ও সহায়তার অঙ্গীকার করে। পাশাপাশি পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনা, মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার, দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন ও তদন্তে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তারও আশ্বাস ছিল।

ঘাটতি: একদিকে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, রোহিঙ্গা সংকট ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় আন্তর্জাতিক সমর্থন, অন্যদিকে মানবাধিকার লঙ্ঘন, সীমান্ত সমস্যা, রাজনৈতিক উত্তেজনা ও ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের টানাপোড়েন অবস্থা বিদ্যমান ছিল। অন্তর্বর্তী সময়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সরকারের অস্পষ্ট অবস্থান ও তথ্য প্রকাশে ঘাটতি বিশেষ করে মানবিক করিডোর দেওয়া সংক্রান্ত বিষয় এবং বাংলাদেশের সাথে ভারতের বিভিন্ন অবন্ধুসুলভ আচরণ অব্যাহত ছিল। ভারত স্ব-প্ররোচিত কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক পরাজয় মেনে

নিতে ব্যর্থতার পরিচয় দেয় এবং ঢাকার সাথে নয়াদিল্লির অস্থিতিশীল সম্পর্কের মধ্যে যার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় যা ক্রীড়াঙ্গনের প্রতিকূল রাজনীতিকরণের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার খাতের সংস্কার সরকারের যথাযথ মনোযোগ পায়নি। এসব খাতে অংশীজনদের মতামতকে অগ্রাহ্য করার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে দলীয় লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতি চলমান ছিল। একদিকে বিভিন্ন খাতে অস্থিরতার পেছনে রাজনীতি ও আমলাতন্ত্রের প্রভাব, অন্যদিকে যৌক্তিক ও অযৌক্তিক আন্দোলনের দাবি মেনে নেওয়ার প্রবণতাও দেখা গেছে। আর্থিক খাতসহ অন্যান্য খাতের সংস্কার উদ্যোগে (পরিবেশ সংরক্ষণ, আমদানি-রপ্তানি, বাজার ব্যবস্থাপনা, জ্বালানি) সিন্ডিকেটের প্রভাব অব্যাহত ছিল।

৬. অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা

ক. রাজনৈতিক দল

সংস্কারের ক্ষেত্রে ভূমিকা: জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে সক্রিয়ভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করলেও জুলাই সনদে অন্তর্ভুক্ত ৮৪টি বিষয়ের মধ্যে ৫৬টি বিষয়ে কোনো না কোনো দলের ভিন্নমত ('নোট অব ডিসেন্ট') ছিল। প্রায় ২০টি সংস্কার ইস্যুতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ ছিল। মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস সঠিকভাবে উপস্থাপিত না হওয়ার অভিযোগে সিপিবিসহ চারটি রাজনৈতিক দল, এবং জুলাই সনদ আদেশ, গণভোট এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট না থাকায় এনসিপি জুলাই সনদে স্বাক্ষর করা থেকে বিরত ছিল (তবে নির্বাচনের পর এনসিপি জুলাই সনদে স্বাক্ষর করে)। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি, নোট অব ডিসেন্ট (সংস্কার প্রস্তাবে ভিন্নমত), গণভোটের সময়কাল, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ও জোটের মধ্যে প্রধানত বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপি, বিপরীতমুখী অবস্থানের ফলে পুরো সংস্কার কার্যক্রমের বাস্তবায়ন নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একমত হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা লক্ষ করা গেছে। অন্যদিকে সরকার ও ঐকমত্য কমিশন অন্য দলের পক্ষ হয়ে বা বিশেষ কোনো দলকে সুবিধা দিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে বলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভিযোগ ছিল।

রাজনৈতিক দলগুলোর নিজ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও দলের স্বার্থ বিবেচনায় সংলাপে অনড় অবস্থান গ্রহণ করতেও দেখা গেছে। সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে কয়েকটি দল উদ্দেশ্যমূলক রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে, যেমন সংলাপ চলমান থাকা অবস্থায় আন্দোলন করার হুমকি, বিক্ষোভ বা প্রতিবাদ সমাবেশ করা। পাঁচটি সংস্কার কমিশনের ৮৪টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হলেও রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, নারী, গণমাধ্যম ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কয়েকটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক ও শক্তি নারী সংস্কার কমিশন বাতিল ও কমিশনের প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান এবং আন্দোলন করতে দেখা যায়। নারী কমিশন সম্পর্কে অবমাননাকর ও অশ্লীল মন্তব্য এবং সহিংস আন্দোলন সংগঠনের পরও সরকারের নির্লিপ্ততা চোখে পড়ে। এ কারণে নারী সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব বাস্তবায়নও অনিশ্চিত হয়ে যায়। রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ও সুশাসন বিষয়ক আলোচনা, বিশেষ করে রাজনীতিতে অর্থ, পেশী ও ধর্মের অপব্যবহার রোধে প্রয়োজনীয় সংস্কার উপেক্ষিত ছিল।

নির্বাচন সংক্রান্ত ভূমিকা: অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে নির্বাচনের তারিখ, রাষ্ট্র সংস্কার, অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ, গণভোট নিয়ে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, সন্দেহ, বিতর্ক ও সহনশীলতার ঘাটতি লক্ষণীয় ছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নির্বাচনকে রাষ্ট্র সংস্কার ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার কার্যক্রমের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়। নতুন নির্বাচন কমিশন গঠনের পর থেকে নতুন নতুন রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ও নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে থাকে। নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধন লাভের জন্য মোট ১৪৪টি দল আবেদন করলেও প্রাথমিক বাছাইয়ে অধিকাংশ দল নিবন্ধন শর্ত পূরণ করতে পারেনি এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দলই ছিল নামসর্বস্ব। নতুন নিবন্ধনপ্রাপ্ত ১৪টি রাজনৈতিক দলের কয়েকটির নিবন্ধন নিয়ে পক্ষপাত, দলীয় প্রভাব এবং দুর্নীতির অভিযোগ ছিল। বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীদের প্ল্যাটফর্ম নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লেও নতুন নতুন প্ল্যাটফর্ম তৈরি হতে থাকে। কর্তৃত্ববাদ সরকার পতন-পরবর্তী সময়ে দেশে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের কথা বলা এবং নতুন নতুন দলের আত্মপ্রকাশ ঘটলেও পূর্বের মতোই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নতুন দ্বিদলীয় রাজনৈতিক মেরুকরণ দেখা যায়। এর ফলে নতুন রাজনৈতিক শক্তির আত্মপ্রকাশ ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বাধাগ্রস্ত হয়।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রার্থী মনোনয়ন এবং জোট গঠনের ক্ষেত্রে দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থ, পেশীশক্তি, পরিবারতন্ত্রের প্রভাব অব্যাহত ছিল, ফলে বিভিন্ন দলে ভাঙ্গন, পদত্যাগ, বহিষ্কার, দলীয় কোন্দল, সহিংসতা বৃদ্ধি পায় এবং মনোনয়নবঞ্চিত প্রার্থী/কর্মীদের বিক্ষোভ, অবরোধ কার্যক্রম দেখা যায়। জুলাই জাতীয় সনদে প্রতিটি রাজনৈতিক দল কমপক্ষে পাঁচ শতাংশ নারীদের মনোনয়নের অঙ্গীকার করলেও নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ৫০টি দলের মধ্যে ৩০টি দলের একজনও নারী প্রার্থী ছিল না। জামায়াতে ইসলামীসহ ধর্মভিত্তিক দলগুলো এবং অন্যান্য কয়েকটি দল কোনো নারীকে মনোনয়ন দেয়নি। দলীয় প্রার্থীদের মধ্যে নারী প্রার্থীদের মনোনয়ন দেওয়ার হার ৩.৫ শতাংশ, তবে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে এই হার ৭.৩ শতাংশ। সার্বিকভাবে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য মাত্রায় সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক, প্রতিযোগিতামূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক হলেও নির্বাচনে পুরাতন রাজনৈতিক চর্চা তথা নির্বাচনী সংঘাত, দলীয় কোন্দল, ক্ষমতার জন্য অসুস্থ প্রতিযোগিতা, রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের নির্বাচনে অর্থ, ধর্ম ও পেশী, পুরুষতান্ত্রিক ও গরিষ্ঠতান্ত্রিক শক্তির ব্যবহার অব্যাহত ছিল। জামায়াত ও বিএনপি উভয় জোট

থেকে কিছু আসনে ভোট গণনায় কারচুপি ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পাল্টাপাল্টি অভিযোগ দেওয়া হয় এবং উক্ত আসনগুলোতে ভোট পুনঃগণনার দাবি জানানো হয়।

রাষ্ট্র ও সরকারি কার্যক্রমে ভূমিকা: কোনো স্বচ্ছ গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়া বা মানদণ্ড অনুসরণ না করে সচিবালয় থেকে শুরু করে সরকারি বা রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতিতে দুইটি দলের প্রভাবের অভিযোগ পাওয়া গেছে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের প্রভাবও অনেক ক্ষেত্রে অব্যাহত থাকার অভিযোগ ছিল। সরকারের বিভিন্ন উপদেষ্টার বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ ছিল। বিভিন্ন সময়ে দুই ছাত্র প্রতিনিধিত্বকারী উপদেষ্টার নিরপেক্ষতা নিয়ে বিএনপি প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং তাঁদের পদত্যাগ দাবি করে। অপরদিকে এনসিপির পক্ষ থেকে বিএনপির প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে সরকারের তিন উপদেষ্টা ও নির্বাচন কমিশনের পদত্যাগ দাবি করা হয়।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পৃক্ততার অভিযোগ উঠে। এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল 'মব' তৈরি; সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করা; থানা ঘেরাও, বিক্ষোভ; কয়েকটি ধর্মভিত্তিক দলের সম্পৃক্ততায় মাজার ভাঙা; নারীদের রাস্তাঘাটে হেনস্তা করা; মেলা-ওরস-গান-নাটকের অনুষ্ঠান বন্ধ করা; পাঠাগারে হামলা; এবং বিভিন্ন সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর হামলা করা। প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, ছায়ানট ও উদীচীর হামলা ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় একটি রাজনৈতিক দলের 'ভাতৃপ্রতিম' ছাত্র সংগঠনের সম্পৃক্ততা থাকলেও সংশ্লিষ্ট দল ও সরকারের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বিভিন্ন শীর্ষ সন্ত্রাসীদের জামিন মঞ্জুরের কয়েকটি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সহায়তা ও প্রশ্রয়ের অভিযোগ উঠে এবং কর্তৃত্ববাদী সরকারের দোসর হিসেবে ও অভ্যুত্থানে হত্যার অভিযোগ তুলে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রাজনৈতিক মামলা দায়ের করতেও দেখা গেছে।

সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল বিরোধিতা, সরকারের সমালোচনা এবং কর্মসূচি ঘোষণা করে। অন্তর্বর্তী সরকারের কাজের এখতিয়ার নিয়েও প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়, যেমন বন্দর ব্যবস্থাপনা ও মানবিক করিডোর প্রদানের বিষয়ে কয়েকটি দলের পক্ষ থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। এই সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে অন্তর্কোন্দল ও সহিংসতা অব্যাহত ছিল। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কিত পরিসংখ্যান থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, আগস্ট ২০২৪ থেকে জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ১৮ মাসে মোট ৬৭৫টি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনায় ১৬৯ জন রাজনৈতিক কর্মী নিহত হয় এবং আহত হয় ৭,৬৯৮ জন। এর মধ্যে ৬১৭টি ঘটনায় (৯১.৪ শতাংশ) বিএনপি, আওয়ামী লীগের ১২৫টি ঘটনায় (১৮.৫ শতাংশ), এবং জামায়াতের ৮০টি ঘটনায় (১১.৯ শতাংশ) সম্পৃক্ততা ছিল। অন্যদিকে এনসিপি ১২টি (১.৮ শতাংশ); বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ১৩টি (১.৯ শতাংশ); এবং অন্যান্য দল ১৭টি (২.৫ শতাংশ) সহিংসতামূলক ঘটনার সাথে জড়িত ছিল। সরকার পতনের পর আওয়ামী লীগের দখলে থাকা প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রমের দখল ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ও সংঘাত অব্যাহত ছিল। এছাড়া পরিবহন টার্মিনাল ও স্ট্যান্ড থেকে চাঁদাবাজি; সিলেটের কোয়ারি ও নদ-নদী থেকে পাথর লুটপাট; সেতু, বাজার, ঘাট, বালু মহাল ও জল মহাল, ইজারা ইত্যাদি ক্ষেত্রে দলীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও এবিষয়ে বিভিন্ন সংঘাতের ঘটনা লক্ষ করা যায়। এসব ক্ষেত্রে দলগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর ছিল না এবং তাদের কর্মীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নজির দেখা যায়নি।

খ. নাগরিক সমাজ

রাষ্ট্র সংস্কার কার্যক্রমে নাগরিক সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছিল। উপদেষ্টা পরিষদ, বিভিন্ন সংস্কার কমিশন, টাস্কফোর্স, শ্বেতপত্র ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠনে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে নাগরিক সমাজ সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। রাষ্ট্র সংস্কারে রাজনীতি, সংবিধান, নির্বাচন, অর্থনীতি, দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা; বিভিন্ন আইনের খসড়ায় মতামত প্রদান; বিভিন্ন আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের সুপারিশ প্রস্তাবে নাগরিক সমাজ ভূমিকা পালন করে। দলবাজি, দখল, চাঁদাবাজি, গ্রেপ্তার ও মামলা বাণিজ্য, ইত্যাদি বিষয়ে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা যায়। মানবাধিকারের পক্ষে ও রাজনৈতিক সহিংসতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে নারী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, সাংবাদিক, লেখক ও মানবাধিকারকর্মীদের ওপর হামলা, মব সহিংসতা ও হয়রানির ঘটনায় প্রতিবাদ করে। একাত্তর ও চব্বিশের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের দৃশ্যমান অবক্ষয়, বিশেষ করে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতির প্রতি হুমকি এবং বহু-জাতি, বহু-গোষ্ঠী, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু সংস্কৃতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পরিচয়ের পরিপন্থী শক্তির বিকাশের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করে। তথ্য ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ক ভূমিকা পালনসহ ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা, গুজব ও অপতথ্য ছড়ানো নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ ও প্রতিবাদ বজায় রাখে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নির্বাচন, সরকারের গ্রহণযোগ্যতা, জনপ্রিয়তা, গৃহীত উদ্যোগের মূল্যায়ন নিয়ে জরিপ প্রকাশ করা হয়। পাচারকৃত অর্থ ফেরত, জাতিসংঘ ও উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে নাগরিক সংলাপ, ট্রানজিশনাল জাস্টিস, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষা, এবং রিপোর্টিং ও নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় নাগরিক সমাজের সম্পৃক্ততা দেখা যায়।

গ. গণমাধ্যম

রিপোর্টারস উইদাউট বর্ডার (আরএসএফ)-এর ২০২৫ এর প্রতিবেদনে প্রেস ফ্রিডম সূচকে বাংলাদেশ ১৬ ধাপ উন্নতি করলেও গণমাধ্যমের স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশ নিশ্চিত হয়নি। গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন স্বাধীন গণমাধ্যম ও স্বাধীন সাংবাদিকতার অন্তরায় হিসেবে ১৩টি আইনের বিভিন্ন ধারা চিহ্নিত করলেও সংস্কারের জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। গণমাধ্যম সংস্কার

কমিশন সাংবাদিক সুরক্ষা আইনের খসড়া প্রস্তুত করে দিলেও কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা ছাড়াই তা বাদ দেওয়া হয় এবং জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন ও সম্প্রচার কমিশন অধ্যাদেশের খসড়া প্রণয়ন করা হলেও তা দেশে মুক্তগণমাধ্যম বিকাশে জনপ্রত্যাশার প্রতি পরিহাসস্বরূপ ছিল। তথ্য মন্ত্রণালয় শুরুতে কয়েকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতে উপদেষ্টাদের নিয়ে কমিটি গঠন করলেও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। গণমাধ্যম নিবন্ধন দেওয়ার প্রক্রিয়া কর্তৃত্ববাদী শাসনামলের মতোই বিদ্যমান ছিল। ২০২৫ সালে একটি নতুন রাজনৈতিক দল ও প্ল্যাটফর্মের দুইজন নেতাকে একাধিক টিভি চ্যানেলের লাইসেন্স প্রদান করার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট মানদণ্ডের ঘাটতি দেখা গেছে। প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন তালিকা সংশোধন নিয়ে সরকারের বিতর্কিত কার্যক্রম লক্ষ করা গেছে, যেমন তিন দফায় ১৬৭ জন সাংবাদিকের প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিল এবং সচিবালয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সাংবাদিকদের প্রবেশ সীমাবদ্ধ করা হয়। তবে পরবর্তীতে প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন নীতিমালা, ২০২২ সংশোধন করা হয়।

গণমাধ্যমের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব তৈরির চেষ্টা না থাকলেও 'মব' সহিংসতার মাধ্যমে গণমাধ্যম কার্যালয়গুলোতে চাপ সৃষ্টির ঘটনা লক্ষ করা গেছে। সাংবাদিক, লেখক ও মানবাধিকারকর্মীদের ওপর হামলা ও হয়রানির ঘটনা অব্যাহত ছিল। এর মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে ছয়জন সাংবাদিক দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন হামলায় নিহত হওয়া; প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে নজিরবিহীনভাবে মব সৃষ্টি করে হামলা-লুটপাট-ভাঙচুর-অগ্নিকাণ্ড ঘটানো যেখানে সরকারের নিষ্ক্রিয় ও অকার্যকর ভূমিকা পালন; আগস্ট ২০২৪ সাল থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ সাল পর্যন্ত ৪৯৭টি হয়রানির ঘটনায় প্রায় ১,১০৪ জন গণমাধ্যম কর্মী হয়রানির শিকার হওয়া উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ২০৪ গণমাধ্যম কর্মীকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান সংক্রান্ত হত্যা মামলাসহ বিভিন্ন মামলায় আসামি করা হয় এবং বিভিন্ন মামলায় ৩০ জনকে গ্রেফতার করা হয় ও তাদের জামিন থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। আটটি সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং ১১টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের বার্তা প্রধানকে বরখাস্ত করার পাশাপাশি অন্তত ১৮৯ জন সাংবাদিককে চাকরিচ্যুত করা হয়। এ সময়ের মধ্যে ২৯টি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পর্যায়ে রদবদল হয় এবং একটি অনলাইন পোর্টালের মালিকানা পরিবর্তন হয়। অপরদিকে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে অপব্যবহারের প্রবণতাও দেখা গেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে প্রতিপক্ষ দল, সরকারের বিরুদ্ধে গুজব ও মিথ্যা তথ্য প্রচার; বিরুদ্ধ মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক 'ট্যাগ' ব্যবহারের প্রবণতা; এবং গণমাধ্যমের ফটোকার্ড ও লোগো ব্যবহার করে অপতথ্য ছড়ানো হয়। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে সরকারের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি ছিল।

ঘ. সামরিক বাহিনী

সেনাবাহিনী কর্তৃত্ববাদ পতনের ক্ষেত্রে আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে ইতিবাচক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সময় তারা অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম ক্ষমতার স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হয়, কিন্তু তারা রাজনীতি থেকে দূরে থাকার ঘোষণা দেয়। মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্তদের একটি অংশের দেশত্যাগে অন্যান্যদের সাথে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সহায়তার অভিযোগ উঠে।

মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ২৫ জন বিভিন্ন পর্যায়ের সাবেক ও বর্তমান সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। তাদের জন্য সাবজেল ঘোষণা হওয়া নিয়ে বিভিন্ন সমালোচনা এবং পদমর্যাদা-ভিত্তিক বৈষম্যমূলক পৃথক ব্যবস্থা গ্রহণে প্রভাব বিস্তার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। বেসামরিক প্রশাসন বিশেষ করে পুলিশের নৈতিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনী সহায়ক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিতে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে দৃশ্যমান ঘাটতি ছিল। এছাড়া বিডিআর হত্যাকাণ্ডের তদন্ত চলাকালীন সময়ে সেনাবাহিনীর মতামত প্রকাশকে কেন্দ্র করে এ বিষয়ে তাদের মন্তব্য করার এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন উঠে। অন্যদিকে কর্তৃত্ববাদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং জনগণের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন, চাঁদাবাজি এবং আর্থিক খাতসহ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দখলের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যথা ডিজিএফআই, এনএসআই-এর সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্তদের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী "নো কম্প্রোমাইজ উইথ ইনসাফ" নীতিতে ন্যায়বিচার এবং গুম তদন্তে কমিশনকে পূর্ণ সহযোগিতার ঘোষণা করে। তবে তারা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায় অস্বীকার করে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সেনা অভিযানের সময় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে 'বিচারবহির্ভূত নির্যাতন' করার অভিযোগ উঠে। মব ও বিশৃঙ্খলা দমনে কোথাও অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ, কোথাও নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে সেনাবাহিনীর ভূমিকা ও ভাবমূর্তি এসময় প্রশ্নবিদ্ধ হয়। বাংলাদেশ টাইমস কার্যালয়ে সেনা অভিযানে সাংবাদিকদের তুলে নেওয়ার ঘটনায় নাগরিক সমাজ স্বাধীন সাংবাদিকতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। নানাবিধ সংশয়, গুজব ও নির্বাচনী সহিংসতার আশঙ্কা থাকলে এর মধ্যেও সেনাবাহিনীর নিরপেক্ষতা বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতে সহায়তা করেছে।

সুশাসনের ঘাটতি

সময়ের ধারাবাহিকতা ও উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তী সরকারের যে মূল লক্ষ্য ছিল – বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও তার পূর্বে সংঘটিত অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার, রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সংস্কার, দ্রুততম সময়ের মধ্যে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজন, দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ, অর্থপাচার রোধসহ রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারের নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা – তার প্রতিটি ক্ষেত্রে সুশাসনের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে।

আইনের শাসনের ঘাটতি: আইনের শাসনের ঘাটতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উদাহরণ হচ্ছে – গ্রেপ্তার, রিমান্ড ও জামিনের ক্ষেত্রে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ না করা, মামলা ও গ্রেপ্তার বাণিজ্য, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতিতে গ্রেপ্তারকৃতরা

বিচারপ্রক্রিয়া ও আদালতে আক্রমণের শিকার ও লাঞ্ছিত হওয়া, আসামীপক্ষের আইনজীবীর ওপর হামলা, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের (সিএজি)-এর সাংবিধানিক মর্যাদা ও কর্তৃত্ব খর্ব করা, পদোন্নতি পাওয়া বা পদবঞ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুসরণে ব্যর্থতা, বিভিন্ন আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতা বিশেষ করে কঠোর অবস্থান গ্রহণে দ্বিধা ও অন্যদিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করা ইত্যাদি।

সক্ষমতা ও কার্যকরতার ঘাটতি: সক্ষমতা ও কার্যকরতার ঘাটতি হিসেবে যে দৃষ্টান্তগুলো লক্ষ করা যায় তা হলো – পুলিশের বিরুদ্ধে করা বেশিরভাগ মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া, বিচার প্রক্রিয়া পরিচালনায় বিচারক ও কৌসুলিদের দলনিরপেক্ষ, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ঘাটতি, অভ্যুত্থানে হতাহতদের প্রকৃত তালিকা চূড়ান্ত করতে না পারা, আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে পুলিশের সক্ষমতার ঘাটতি, রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যর্থতা, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে না পারা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি অপসারণের ফলে স্থানীয় সরকারের সেবা প্রদান বিঘ্নিত হওয়া ইত্যাদি।

স্বচ্ছতার ঘাটতি: যে সকল বিষয়ে স্বচ্ছতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে – বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ, পদোন্নতি ও অব্যাহতিতে যেমন সরকারের উচ্চপর্যায়ের পদ; আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও বিচার বিভাগে বিচারক, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ও কর্মকর্তা নিয়োগ; প্রশাসন; শিক্ষা; স্বাস্থ্য; জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সিইও ও কোষাধ্যক্ষের নিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। এছাড়া বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের পরিচালনা পর্ষদে সরকারের একজন উপদেষ্টা, বিশেষ সহকারী এবং নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিবকে নতুন পরিচালক হিসেবে নিয়োগেও স্বচ্ছতার ঘাটতি ছিল। বিভিন্ন জনের গ্রেপ্তার নিয়ে লুকোচুরি করা, বিদ্যুৎ খাতের চুক্তি; চট্টগ্রাম বন্দরের চুক্তি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতার অভাব লক্ষ করা গেছে। রাখাইনে 'মানবিক করিডর' দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েও সরকারের অস্পষ্ট অবস্থান ও তথ্য প্রকাশে ঘাটতি ছিল। আইসিটি টাস্কফোর্স কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত শ্বেতপত্র প্রতিবেদন প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রকাশের পর কোন কারণ উল্লেখ ব্যতীত ওয়েবসাইট থেকে অপসারণ করা হয়। শ্বেতপত্র প্রতিবেদনে পক্ষপাতিত্বের মাধ্যমে গুটিকয়েক কর্মকর্তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করে দুর্নীতি-অনিয়মে অভিযুক্ত অন্যতমদের তদন্তের বাইরে রাখার সুযোগ তৈরির অভিযোগ রয়েছে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত না করা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ না করার চর্চা এবং তথ্য গোপন করার প্রবণতা অব্যাহত ছিল।

সমন্বয় ও অংশগ্রহণের ঘাটতি: যে সকল ক্ষেত্রে সমন্বয় ও অংশগ্রহণের ঘাটতি লক্ষ করা যায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে – সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলো প্রতিনিধিত্বশীল না হওয়া, বিভিন্ন আইন প্রণয়ন বা সংশোধনের ক্ষেত্রে সব অংশীজনকে সম্পৃক্ত না করা, এনবিআর ভেঙ্গে দুটি নতুন বিভাগ গঠনের ক্ষেত্রে অংশীজন প্রস্তাবিত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ উপেক্ষা করা, কোনো অংশীজনকে সম্পৃক্ত না করে ২০২৬-২০৫০ সালের জন্য জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনার খসড়া চূড়ান্ত করা, ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র ইস্যুতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন ও আইন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের ঘাটতি।

সিদ্ধান্তহীনতা/ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন: সিদ্ধান্তহীনতা বা সরকারের বারবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে – সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়স নির্ধারণ, সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নিয়োগকৃতদের প্রত্যাহার, সরকারি চাকরি অধ্যাদেশ, রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ প্রণয়নের পর প্রবল বিরোধিতার মুখে সংশোধন ইত্যাদি।

জবাবদিহির ঘাটতি: জবাবদিহির ঘাটতির উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে – বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্তদের দেশত্যাগে সহায়তাকারীদের জবাবদিহির আওতায় না আনা এবং গুমের আলামত নষ্টের সাথে জড়িতদের জবাবদিহির আওতায় না আনা।

রাজনৈতিক প্রভাব: সরকারি কার্যক্রমে রাজনৈতিক প্রভাবের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উদাহরণ হচ্ছে – প্রশাসন, বিচার বিভাগ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ ও পদোন্নতি, স্থানীয় সরকার (ঢাকা ওয়াসার এমডি নিয়োগ) ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের (ক্রিকেট বোর্ড গঠনে) অধীন সংস্থাগুলোতে নিয়োগের ঘটনায় রাজনৈতিক প্রভাব, উপদেষ্টা পর্যায়ে নিয়োগে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা, বিভিন্ন ব্যক্তির দুর্নীতির মামলা থেকে অব্যাহতি ও খালাসে রাজনৈতিক প্রভাব লক্ষ করা যায়। এছাড়া বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশনের লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক প্রভাব, দলীয় ঘনিষ্ঠতা ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ।

ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব: বেশ কিছু ক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো – প্রশাসন, বিচার বিভাগ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ ও পদোন্নতি, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের নিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনিয়ম ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। গ্রামীণ ব্যাংকে সরকারের মালিকানা হ্রাস ও গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনে স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা যায়। নিজ এলাকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন, নিজস্ব বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা এবং স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশকে প্রভাবিত করার চেষ্টার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। একজন উপদেষ্টার মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে একই খাতে নতুন ব্যবসা শুরুর উদ্যোগ গ্রহণের দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। একজন উপদেষ্টার নিজ এলাকায় স্বার্থের দ্বন্দ্বে দুষ্ট অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, মসজিদ, মাদ্রাসা ও মন্দিরে বিশেষ উন্নয়ন বরাদ্দ এবং উপদেষ্টার বাবার নামে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে (এলজিইডি) ঠিকাদারি লাইসেন্স

প্রদানের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে স্থগিত হওয়া ও তদন্তনাধীন একটি প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীর চাপ প্রয়োগ ও দুদকের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টার ঘটনা লক্ষ করা গেছে।

দুর্নীতি: অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমে বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উদাহরণ হচ্ছে – বঞ্চিত হওয়ার নামে সরকারি আমলাদের অবৈধ সুযোগ-সুবিধা আদায়, ডিসি পদায়নে দুর্নীতি, অর্থের বিনিময়ে ফ্যাসিবাদের দোসরদের পুনর্বাসন, স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন ক্রয়ে দুর্নীতি, পিপিপি আইন ও নীতি লঙ্ঘন করে চট্টগ্রাম বন্দরের চুক্তি সম্পাদন, কমপক্ষে দুইজন উপদেষ্টার ব্যক্তিগত কর্মকর্তার দুর্নীতি ঘটনা লক্ষ করা গেছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে সেবাখাত তথা বিআরটিএ, পাসপোর্ট, ভূমি, আইন-শৃঙ্খলা, বিচারিক সেবা, স্বাস্থ্য, জাতীয় পরিচয়পত্রসহ বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতি অব্যাহত ছিল।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নজিরবিহীন আত্মত্যাগের বিনিময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি অসামান্য অর্জন। রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার অভূতপূর্ব সুযোগ তৈরি হয়। গবেষণায় দেখা যায়, এ অভীষ্ট অর্জনে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন অংশীজনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বহুবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অন্তর্বর্তী সময়ে বিচার, সংস্কার, নির্বাচন, রাষ্ট্র পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং রাষ্ট্র সংস্কার, বিচার ও নির্বাচনের অবকাঠামো তৈরি হয়। তবে এ অবকাঠামো পর্যাপ্ত শক্তিশালী না হওয়ায় তিনটি ক্ষেত্রেই বিশেষ করে রাষ্ট্র সংস্কারের ভিত্তি যতটুকু মজবুত হতে পারতো ততটুকু হয়নি। এ ভিত্তির ওপর রাষ্ট্র সংস্কারের বাস্তব সুফল অর্জনের পথে ইতোমধ্যে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরও প্রবল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

গবেষণায় আরও দেখা যায়, রাষ্ট্র সংস্কারের বেশ কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে জুলাই সনদে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে ঐকমত্যে পৌঁছানো একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হলেও রাষ্ট্র সংস্কারের মূলমন্ত্র তথা জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার অভীষ্টের জন্য অপরিহার্য বিধান সম্পর্কে জুলাই সনদে ঐকমত্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের প্রতিরোধের ফলে সংস্কারের ভিত্তি দুর্বল হয়। পরবর্তীতে অধ্যাদেশ ও সরকারি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রতিরোধক মহল, বিশেষ করে আমলাতন্ত্রের প্রভাবশালী মহলের অন্তর্ঘাতমূলক অপশক্তির কাছে সরকারের নতি স্বীকারের ফলে সংস্কার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। আশু বাস্তবায়নযোগ্য সংস্কারে অগ্রগতি অর্জনে সরকারের ব্যর্থতা এবং বিশেষ করে জুলাই সনদের আওতার বাইরে সংস্কার কমিশনসমূহের সুপারিশ বাস্তবায়নে কোনো উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ছিল না। এছাড়া সংস্কার প্রতিরোধক ঝুঁকি বিশ্লেষণে আগ্রহ না থাকার কারণে প্রতিরোধক শক্তির হাতে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

কর্তৃত্ববাদী সরকারের আমলে এবং জুলাই আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হলেও যথাযথ বিচারিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করার ক্ষেত্রেও ঘাটতি বিদ্যমান ছিল। বিভিন্ন অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কা সত্ত্বেও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সুষ্ঠু, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তবে নির্বাচনী ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার প্রবণতা অব্যাহত ছিল।

রাষ্ট্র পরিচালনায় একদিকে প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রধানত উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অপসারণের মাধ্যমে দলীয়করণ থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা যেমন ছিল, অন্যদিকে একদলের স্থলে অপর দলের দলীয়করণ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে কার্যত দলীয়করণের ধারা অব্যাহত রাখা হয়। পুলিশ-প্রশাসনসহ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অস্থিরতা, নতুন রাজনৈতিক বলয় তৈরির প্রয়াস এবং ব্যাপক রদ-বদলের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক অকার্যকরতা দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে সরকারের নিয়ন্ত্রণহীনতাও দৃশ্যমান ছিল। সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অ্যাড-হক প্রবণতা, প্রশাসন পরিচালনায় অনেক ক্ষেত্রে সরকারের দৃঢ়তা ও কর্মপরিকল্পনার ঘাটতি, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্বশীলদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীনতার পাশাপাশি সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর পরিবর্তন করার চিত্রও দেখা গেছে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত না করা, সরকারি দপ্তরসমূহে তথ্য গোপন করার প্রবণতা, এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ না করার চর্চা অব্যাহত ছিল। অবাধ তথ্য প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতের বিষয়টি গুরুত্ব পায়নি। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও সরকারি কর্মচারীদের সম্পদ বিবরণী প্রকাশের চর্চা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা সত্ত্বেও ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপনে সরকার ব্যর্থ হয়।

সুশাসনের আলোকে উপরোক্ত খাতগুলোতে বেশ কিছু ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের অংশ হিসেবে নতুন ও পুরনো রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত, জনগণের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার জন-আকাঙ্ক্ষা থাকলেও এই প্রত্যাশা পূরণের কোনো দৃশ্যমান দৃষ্টান্ত ছিল না। দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক চর্চার ঘাটতি, ক্ষমতার রাজনীতি, অর্থ, পেশি ও ধর্মনির্ভর রাজনৈতিক চর্চা, দলবাজি, দখলবাজি, চাঁদাবাজি, এবং প্রথাগত নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন অব্যাহত থাকতে দেখা গেছে।

অর্থ, পেশি ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতির হাতে নারীর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব জিম্মি দশার শিকার হয়। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিকাশ ও প্রভাব দৃশ্যমান ছিল। অনেক ক্ষেত্রে সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের কারণে জেন্ডার, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ে, যা বৈষম্যবিরোধী চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক। সাম্য, মানবিক মর্যাদা, ন্যায়বিচার, সকলের সমান অধিকার, সকলের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা বা তোষণমূলক অবস্থানের কারণে ধর্মান্ধদের ক্ষমতায়ন করা হয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের শুরুর দিকে বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমে নাগরিক সমাজকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হলেও পরবর্তী সময়ে তাদের অগ্রাহ্য করার প্রবণতা দেখা গেছে। বিভিন্ন সংস্কারে নাগরিক সমাজের সুপারিশ উপেক্ষা করা হয়েছে। অন্যদিকে সরকারের মধ্যে নাগরিক সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ থাকলেও তারা প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে যার ফলে নাগরিক সমাজ সম্পর্কে সাধারণ জনগণের নেতিবাচক ধারণার বিস্তার লাভ করেছে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতার চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে সাংবাদিক ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিশ্চিতে দৃশ্যমান ব্যর্থতার চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা এখন রাষ্ট্রের পাশাপাশি অতিক্ষমতায়িত অরাষ্ট্রীয় শক্তির হাতে জিম্মি। অন্যদিকে গণমাধ্যমের মধ্যেও অভ্যন্তরীণ শত্রুর অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে।

সবশেষে বলা যায়, সুশাসিত, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় ভিত্তি স্থাপনে ব্যর্থতা এবং সর্বোপরি সংস্কারের নামে গৃহীত উদ্যোগ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বাস্তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং প্রত্যাশা পূরণে ক্ষেত্রবিশেষে উল্টো যাত্রা করেছে।

****